"লাশটা কোথায় সরিয়েছেন সেই কথাই আমরা জানতে এলাম।" গোয়েন্দাদের গলা মোটেই চাটু নয়, বরং বেশ কড়াই।

"কোথায় সরিয়েছি ?...আমি ?···না মশাই, আমাকে আর কষ্ট করে' সরাতে হয়নি।..." সান্ত্বনা ক্ষুব্ধস্বরে বলে ওঠে।

"কে সরালো ? খোলসা করে' জবাব দিন। চালাকি রাখুন। আমাদের সঙ্গে চালাকি নয়।"

"লাশই সরিয়েছে নিজেকে।" এই বলে' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দেবার জন্য—কিভাবে, লাশটা চেয়ার থেকে উঠে, কেমন করে' তাকে ঠেলে ফেলে কি রকম তীরবেগে তিরোহিত হোলো—এই সমস্তর ইতিবৃত্ত আর ভূগোল-বৃত্তান্ত ভালো করে বিশদ করে বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে যেই না সান্ত্বনা আসন ছেড়ে দু' এক পা এগিয়েছে এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মিস্ কারফর্ম্মার কাণ্ডকারখানা ওদের ফরমাস মতো—পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছে—অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখল···দেখতে পেল, চোখে-আঙ্গুল-দিয়ে-দেখিয়ে-দেবার অভিপ্রায়ে-ধাবমান তার হাতে কখন্ হাতকড়া পড়ে গেছে!······

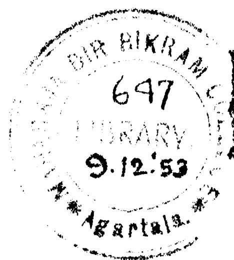
এর পরের পালা খুব সংক্ষিপ্ত।

উপন্যাসের ছলনায় নিজের স্বীকারোক্তির বলে, (অপর কোনো প্রমাণের নিষ্প্রয়োজনীয়তায়), সুবিচারের ফলে এই সেদিন 'আত্ম-জীবনীকার' সান্ত্বনা গুঁইর ফাঁসি হয়ে গেছে।



দেবতার জন্ম!

শিবরাম চক্রবর্তী



শিবরামের লেখা

●

গল্প-উপন্যাস

অথ বিবাহ-ঘটিত

মেয়েদের মন

প্রেমের বিচিত্র গতি

মনের মত বৌ

মেয়েধরা ফাঁদ

প্রেমের পথ ঘোরালো

●

প্রবন্ধ

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি

●

ছোটদের বই

বাড়ী থেকে পালিয়ে

বিনির কাণ্ডকারখানা

শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তির মত

কথা বলার বিপদ !

ইত্যাদি

●



দেবতার জন্ম

ও অন্যান্য গল্প

সেই সঙ্গে

মহা পাকিস্থানের পথে!

•

শিবরাম চক্রবর্তী-লিখিত

•

পিসিয়েল, শৈল চক্রবর্তী,

সূর্য রায়, রেবতীভূষণ

কর্তৃক বিচিত্রিত



দি বুক্ এম্পোরিয়াম লিমিটেড্
২২।১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬

'আমার লেখা'—গ্রন্থমালা

বুক্‌ এম্পোরিঅম্‌ লিমিটেডের পক্ষে
লেখক শিবরাম চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
—সর্ব সত্ব লেখকের—



প্রয়োগশিল্পী
শ্রীকৃষ্ণকালী চক্রবর্তী



কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫ ডি. এল.
রায় ষ্ট্রীট্‌ থেকে শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কর্তৃক মুদ্রিত



—ব্লক্‌—
এস্‌ আর সেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স্‌



প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৪



দাম তিন টাকা

শ্রীমান্ শিবসত্য চক্রবর্তী
নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

এই সংকলনের গল্পগুলি বিভিন্নকালে আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, দেশ প্রভৃতি দৈনিক ও সাময়িক পত্রের সাধারণ ও বিশেষ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তৎকালীন প্রকাশিত গল্পের আনুষঙ্গিক ছবির অমর্যাদা না করে' কোথাও কোথাও শিল্পীর কীর্তি আমার বইয়ের পৃষ্ঠায় আমি অক্ষুণ্ণ রেখেছি—এই সুযোগ লাভের জন্য উক্ত পত্র পত্রিকা এবং তাঁদের শিল্পীদের কাছে আমার ঋণ আর কৃতজ্ঞতা আমি স্বীকার করি।

এই বইয়ের প্রচ্ছদ-রচনা শিল্পী সূর্য রায়ের—তাছাড়া, প্রথম পৃষ্ঠার কার্টুনটিও তাঁর। পাঞ্চ-জন্য গল্পটি প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট্ পিসিয়েল্ মশায়ের বিচিত্রনা। শিক্ষা দেয়া সহজ নয়—গল্পটির ছবিগুলি উদীয়মান ব্যঙ্গচিত্রী রেবতীভূষণের আঁকা। বাকী লেখাগুলিকে রেখান্বিত করেছেন বন্ধু এবং বিখ্যাত শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী : এঁদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ।







দেবতার জন্ম



বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই হোঁচট্ খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন ধরেই ভাবছি কি করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার তেমন কোনো তাড়া ছিল না, অন্তত ঐরূপ তীরবেগে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায় ছিলনা আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত করে দিল যে অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হলুম। কী ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিলো হুঁসিয়ার— তাই রক্ষে।

সেদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়। আমার জীবন-পথের মাঝখানে সামান্য একটুক্‌রো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে কোনোদিন এরূপ কল্পনা করিনি। তাছাড়া, ক্রমশই এটা জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদস্খলনকে মার্জনার চোখে দেখবে এমন আশা আমি করতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্, হয় ও থাকুক নয় আমি। ও থাকলে আমি বেশিদিন থাকব্ কিনা সন্দেহস্থল। তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে, বেশি বাঞ্ছনীয় তখন একদা প্রাতঃকালে একটা কোদাল জোগাড় করে লেগে পড়তে হোলো।

একটা বড় গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার ওপর মাথা তুলেছিল। বহু পরিশ্রমের পর যখন ওটাকে সমূলে উৎপাটন

করতে পেরেছি, তখন মাথার ঘাম মুছে দেখি আমার চারিদিকে রীতিমত জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সরব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কেউ চান এই পাথরটা ?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারু ঔৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করতে হোলো—যদি দরকার থাকে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার শ্রম তাহলে সার্থক বিবেচনা করব এবং বলা বাহুল্য আমি খুসী হব।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এটা খুঁড়ছিলেন কেন ? কোনো স্বপ্ন টপ্ন পেয়েছেন নাকি ?

আমি লোকটার দিকে একটু তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয়।

পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করা গেল। কিন্তু আমার কথায় যেন ওর প্রত্যয় হোলো না, কয়েকবার আপনমনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছেন পান্ নি ? কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ ?

—কিচ্ছু না।

লোকটার কৌতুহলকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বল্লাম দু কাপ চা তৈরি করতে। আমার জন্যই দু' কাপ। পাথরটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম—প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেছলাম, বল্‌তে কি।

এপরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে এবং বেড়িয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ; অনেক সময় হয় না, যখন অন্যমনস্ক থাকি। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে পেরেছি, কেননা আমাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধূলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। যারা সকালে বিকালে হোস্ পাইপে রাস্তায় জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারু স্নেহদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারার শ্রীবৃদ্ধি দেখে সুখী হলাম।

—ব্যাপার কিরকম বুঝচেন্ ?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হয়ে ফিরে তাকালাম। সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি ? না, কোনো প্রত্যাদেশ টত্যাদেশ পেলেন ?

—না না, তা কেন ? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা !

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারেন।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। কেউ নেবে না—কি বলেন ?

প্রশ্নটা এইভাবে করলো যেন যে-রকম দামী জিনিসটা পথে পড়ে আছে অমন আর ভূভারতে কোথাও মেলে না এবং ওর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ করবার মতলবে ঘোরতর চক্রান্তে লিপ্ত ; ছোঁ

মেরে লুফে নেবার তালে হাত বাড়িয়ে সবাই যেন লোলুপ। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—না না, আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, সরকার বাহাদুর তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাঁচীর অতিথশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, তাছাড়া, আপনি নিজেই যখন এদিকে কড়া নজর রেখেছেন তখন তো চিন্তা করার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বল্‌ল—আপনার যেমন কথা। দেখেছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা করে গেছে ?

ভালো করে নিরীক্ষণ করি—সত্যিই, দেখিনি তো, এক বেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ করে সিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালোই হয়েছে। এতদিনে তবু ওর কান্তি ফিরলো এবং আরেকটি সমঝদার জুটলো।

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখলাম। কপাল কুঁচ্‌কে সে বললে—সেই তো ভয়। সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে!

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য্য হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অযাচিত উদয় হোলো কিন্তু কোনো সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার এরূপ অনুপস্থিতিতে এই পথ দিয়ে হরদম্‌ যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে বেজায় প্রাণে ব্যথা পাবে অনুমান করা কঠিন নয়। একথা

ভেবে লোকটার জন্য একটু দুঃখই জাগলো ;—কিম্বা, এ সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরই কর্মযোগ ?

অনেকদিন পরে গলির মোড়ের অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! নুড়ির স্থূল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমন ভাবে পুঁতেছে যে উপরের উদ্ধত গোলাকার নিটোল মসৃণ অংশ দেখে শিবলিঙ্গ বলে ওকে সন্দেহ হতে পারে। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য যার, তাকে বাহাদুরি দিতে হয়। নুড়িটার চারিদিকে ফুল বেলপাতা আতপচালের ছড়াছড়ি। সকলের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানে যায় তারাই ফেরার পথে সস্তায় পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের সুবর্ণসুযোগরূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক্ মহাসমারোহেই ইনি এখানে বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

নুড়িটার এই পদোন্নতিতে আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করতে থাক্,—ওর গৌরবে সে-তো আমারই গর্ব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এইজন্য মনে মনে পিতৃত্বের একটা পুলক অনুভব না করে পারলাম না! এবং কায়মনোবাক্যে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেব কিনা মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথে ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম ও মুহ্যমান হয়ে পড়্বে, কিন্তু উল্‌টে ওকে প্রফুল্লই দেখেছি। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-

বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা করে তোলায় কি লাভ।

মাঝে মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ্য করি, দিনকের দিন নুড়িটার মর্য্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম গোটাকত সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ এবং ববম্‌বম্‌ শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে নাক কান বাঁচিয়ে যাওয়া দুষ্কর।• ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমতই অত্যাচার।

যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরি হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মুর্তি ধরে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হয়ে দেখা দেবে। দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হয়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরে একটা চিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে চাম্পারণ যেতে হোলো। অশথতলার পাশ দিয়ে গেলেও চলে, ভাবলাম, যাবার আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু, একেবারে পাতাল ফুঁড়ে ফেঁপে উঠেচেন—এঁর তল নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনা করতে হলে এখানে একটা মন্দির খাড়া না করা চলে না।

একবার বাসনা হোলো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ডেকে বলে দিই কিন্তু জীবন-বীমা করা ছিল না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হতে পারে জানতাম আর তা ছাড়া ট্রেণের বিলম্বও বেশি নেই—ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করাই তার অভিরুচি ছিল কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং স্বচেষ্টায় ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত কিম্বা মর্মাহত কী হোতো বলা কঠিন।

কয়েক মাস বাদে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটখাট একটা মন্দির উঠেছে, শঙ্খ ঘণ্টার আর্তনাদে কান পাতা দায় এবং ভক্তের ভিড় ঠেলে চলা দুরূহ। কিন্তু সে কথা বল্‌ছি না, সব চেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেক জনের আবির্ভাবে, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কলেবর পরিবর্তন পর্যন্ত দেখে। মন্দিরের চত্বরে সে-ই লোকটা—প্রথমতম, সেই আদি ও অকৃত্রিম উপাসক—গেরুয়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের চাপে তাকে এখন আর চেনাই যায় না।

—একি ব্যাপার?

আমিই গায়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

—আজ্ঞে, এই দীনই শিবের সেবায়েৎ।

লোকটি বিনীত ভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনিপুঁজির ব্যব্‌সা ফাঁদা

হয়েছে! এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত করে নজর রাখা হয়েছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতি-শীলতা যে অহেতুক এবং একেবারেই নিস্বার্থ ছিল না, এইটা জেনেই বোধকরি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হয়ে যায়, ভারি রূঢ় হয়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বল্‌ল—অমন বল্‌বেন না। পাথর কি মশাই? শ্রীবিষ্ণু! সাক্ষাৎ দেবতা যে! ত্রিলোকেশ্বর শিব!

উদ্দেশে সে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেল্‌লাম—ওর তল নেই, না?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—সবাই তো বলে।

—তুমি নিজে কী বলো? ওরা তো বলে নিচে যতই কেন খুঁড়ে যাও না, টিউব-কলের মত ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

—কি জানি! তাই হয়তো হবে।

—কতদূর শেকড় নেবেছে খুঁড়ে দেখ্‌ই না কেন একদিন?

জিভ্ কেটে লোকটা বল্‌ল—ওসব কথা কেন? ওতে অপরাধ হয়। বাবা রাগ করবেন—উনি আমাদের জাগ্রত।

—বটে? কিরকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টীকে নিয়ে কিছু করেই কিছু হচ্ছে না—

—য়্যাঁ, বলো কি মহামারী না কি, জানতাম না তো!

—খবরের কাগজেই দেখবেন কিরকম লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে টীকে দেবার ত্রুটি নেই অথচ প্রত্যেক পাড়াতেই—। কিন্তু

আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারু হয়নি দেবতার কৃপায়, আমরা কেউ টীকেও নিইনি কেবল বাবার চন্নামৃত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন ?

এর কি জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা করে বেঁচেছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথেব মহিমা তখন আমার মাথায় উঠেছে। "—আমি এখন চললুম ! আমাকে এক্ষুণি টীকে নিতে হবে। আরেকদিন এসে গল্প করব।" বলে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে ধাবিত হলাম।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দাঁড় করিয়ে সে বল্‌লে—আরে, কোথায় চলেছো এমন হন্তে হয়ে ?

—টীকে নিতে।

—টীকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টীকেয় কিস্‌সু হয় না। তুমি বরং veriolinum 200 এক ডোজ খাও গে, কিং কোম্পানির থেকে —যদি টিকে থাকতে চাও ! পরের হপ্তায় ঐ আরেক ডোজ, তারপরে আরেক—ব্যস্‌, নিশ্চিন্দি। টীকে ফেল্‌ করেছে আক্‌চার দেখা যায়, কিন্তু ভেরিওলিনাম্‌—নেভার্‌!

—বলো কি ? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে ? কেবল ফোঁড়াফুঁড়ি এই তো জেনেছো ! অন্য কিস্সুতে কি আর তোমাদের বিশ্বেস আছে ? আমি হোমিওপ্যাথি প্রাক্‌টিশ ধবেছি, আমি জানি।

—বেশ, তাই খাচ্ছি নাহয়।

কিং কোম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ দু'শ শক্তির ভেরিওলিনাম্‌

গলাধঃকরণ করলাম। যাক, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল। হাল্‌কা হতে পারলাম।

এর পরেই পথ দিয়ে উপরোউপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল—নিশ্চয়ই এরা বসন্ত রোগেই মরেছে? কী সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভেরিওলিনাম্‌ রক্তে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এতক্ষণে এই সব মারাত্মক রোগাণুর কাজ স্নুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়! হাত পা শিটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে—এই বিপদ-সংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও আমার কষ্ট হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুক্‌রো প্রাচীরপত্রে বিখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক কোন্‌-এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে উপায়েই হোক সবার আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছতেই দেখলাম কয়েকজন মিলে খুব ধুমধাম করে প্রকাণ্ড একটা শিলে কী যেন বাট্‌ছেন। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাঁটা হচ্ছে। কণ্টিকারির শেকড়—বেঁটে খেতে হয়। ওর মত বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর কিছু নেই মশাই!

ব্যবস্থামত তাই এক তাল খেয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসা গেল। গায়ে যেন জোর পাচ্ছিলাম না, মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছিল, জ্বর জ্বর ভাব—বসন্ত হবার আগে এই রকমই নাকি হয়। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। দেহটা ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কী হয়েছে তোর?


MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY.

—হয়নি কিছু। বোধহয় হবে।…বসন্ত।

—বালাই ষাট্। বলতে নেই। তা কেন হতে যাবে? এই হর্তুকির টুক্‌রোটা হাতে বাঁধ দিকি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, এই হাতে কত বসন্ত রোগীই তো ঘাঁটলাম, সেবা করলাম, কিন্তু বল্‌তে নেই এরই জোরে কোনোদিন হাম পর্যন্ত হয়নি—। নে ধর্ এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারো হয়নি তোমার? বলো কি? দাও, দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন? কিন্তু এই একটুক্‌রোয় কি হবে? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও যদি তাতে আট্‌কায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকালের দিকে শরীরটা বেশ ম্যাজম্যাজ করতে লাগলো। নিজেকে রীতিমত জ্বরজড়িত মনে হোলো। আয়না নিয়ে ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু'একটা ফুস্কুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, তবে আর বাঁচন নেই, মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—মার অনুগ্রহ না—ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহুঃ। ব্রণ নয়, নিতান্তই মার অনুগ্রহ!

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নে। ও কিছু না, সমস্ত দিন ঘরে বসে আছিস্ একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এরকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে? লোকটা বলছিল ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও

তাই খাবো নাকি ? হয়তো বা চন্নামৃতের বীজাণুধ্বংসী কোনো ক্ষমতা আছে, নেই যে, তা কে বলতে পারে ?···হ্যাঁঃ, ওর যেমন কথা ! ওটা স্রেফ য়্যাক্‌সিডেণ্ট—কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না ! তাছাড়া মনের জোরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়—মারীরও যেখানে মার—সেই মনের জোরই ওদের পক্ষে একটা মস্ত সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করবার মত বিশ্বাসের জোর আমি পাবো কোথায় ?

এ সব যা-তা না করে সকালে টীকে নেওয়াই আমার উচিত ছিল, হয়তো তাতে আট্‌কাতো। এখুনি গিয়ে টীকেটা নিয়ে ফেল্‌ব নাকি ? টীকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড় জোর্ হাম হয়ে দাঁড়ায় আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ওতো শিশুদের হামেসাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই বেরিয়ে পড়ি !

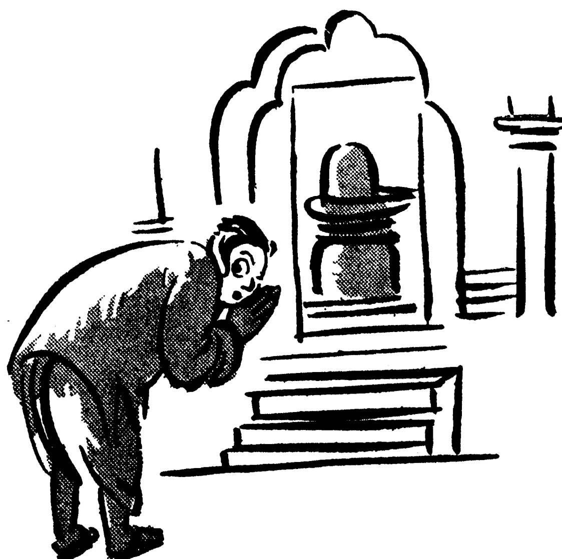
টীকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকালের কথাগুলো মনে পড়ল। হয়তো ঠিকই বলেছে সে। সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাবো ? শেকস্‌পীয়ারের সেই কথাটা—সেই স্বর্গমর্ত্য-হোরাশিও-একাকার-করা বাণী—না, একেবারে ফেল্‌না নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বহুধা বিস্তৃত অনন্ত জগতের কতটুকুই আমরা জানি ? কটা ব্যাপারেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি ? যতই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞাতের সীমান্তে এসে সব ব্যাপারীকেই নতমুখে চুপ করে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে দণ্ডবৎ জানালাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এযাত্রা।

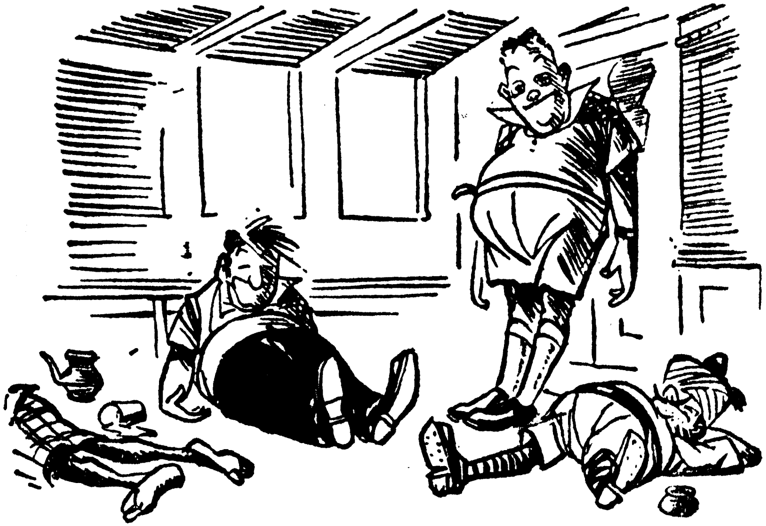
খানিক দূর এগিয়ে এসে ফিরলাম আবার। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুস্কুড়িগুলো হাত দিয়ে আঁচ করা গেল।—এগুলো ব্রণ, না, বসন্ত?

এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ! রক্ষা করো বাবা! বম্ বম্!

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম কেউ দেখে ফ্যালেনি তো?



পাঞ্চ-জন্য



ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গাঁয়ে ছিলেন না, তাঁর ছেলে পতিত-পাবনই চিঠিখানা খুল্‌ল।

"...সদর থেকে বড় দারোগা এবং সার্কেলবাবু যাচ্ছেন তোমাদের এলাকায়। জলপথে তাঁরা যাবেন, অতএব জলপথেই যেন সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসন্তোষের কারণ না ঘটে সেদিকে হুঁসিয়ার থেকো। তাঁরা যেন কিছু না মনে করেন বা মনে করার কোনো ওজোর না পান—সেদিকে বিশেষ নজর রাখবে।..."

সদরস্থ ওদের কোনো শুভার্থীর চিঠি।

চিঠি পড়ে পতিতপাবনের ভুরু কুঁচকে গেল।

"ভারী মুস্কিলে পড়লাম তো! বাবা এখন ক'দিনে ফিরবেন কে জানে, ইদিকে আমি—!" বল্ল সে। মানে, ওর যা যা বলবার ছিল তার কিছুই বল্ল না।

"মুস্কিল কিসের? যেমনটি লিখেছে তেমন তেমনটি করলেই হবে।" আমি ওকে উৎসাহ দিই।

"জলপথে সম্বর্দ্ধনা কি করে যে করব আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে। অনেক নৌকো জড়ো করে' আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে' আনতে হবে বোধহয়? কিন্তু অতো নৌকোই বা আমি পাই কোথায় এখানে? তাছাড়া এখন এ গাঁয়ে কি অতো নৌকো আছে?"

পতিতকে দারুণ দুশ্চিন্তায় নিপতিত দেখা যায়।

"আরে পাগল! জলপথের মানে কি তাই? মোটেই তা নয়।" আমি জানাই।

সবে প্রথম শ্রেণীতে পা দিলেও বাংলা ভাষায় আমি উত্তম পুরুষ—বাল্যকাল থেকেই। নামে জনার্দ্দন না হলেও ভাবগ্রাহীতায় চিরদিনই

আমি ওস্তাদ্। দারোগার পথ আর আমাদের পথ কখনো এক হতে পারে না, সহপাঠীকে আমি বুঝিয়ে দিলাম। আমরা জেলে যাই এবং ওরা জেলে যাওয়ায়। আমরা যখন ঠিক একপথের পথিক নই, আমাদের জলপথও নিশ্চয় আলাদা হবার কথা।

আমার ভাবার্থ শুনে পতিতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল—"ওব্ বাবা! এর মধ্যে য়্যাতো রহস্য?"

"কিন্তু এও তো এক মুস্কিল", হাঁ-কার বন্ধ করে' সে বলে: "ওসব এখন পাই কোথায় এখানে? এধারে কি ওই সব চীজ্ পাওয়া যায়?"

"সদরে কাউকে পাঠিয়ে দাও নাহয়, দু' এক বোতল নিয়ে আসুক্ গে।" আমি বাৎলাই।

কে যাবে সদরে এখন? আর কখন্ ওরা এসে পড়বে তাই বা কে জানে—অতঃপর এই দ্বিবিধ সমস্যা দেখা দিল।

"আমার কি? আমি মানে বলে' দিয়েই খালাস। তোমরা যাতে মানে মানে এবং প্রাণে প্রাণে রেহাই পাও তার পথ দেখিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। আমার কর্ত্তব্য শেষ। তারপর করা না করা তোমার ইচ্ছে।" নিস্পৃহের মতো আমার কথা। যে বস্তু অন্দরের পথে নিয়ে যাতায়াত করতেই লোকে ভয় খায়, পাছে বন্ধুকৃত্যের খাতিরে তাই আনতে আমাকেই সদরপথে পা বাড়াতে হয়, তার গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।

"দাঁড়া, একটা আইডিয়া পেয়েছি।" সে বলে ওঠে: "আগের বার যখন মামার বাড়ী গেছলাম না কলকাতায়? আমার মামাকে একটা জিনিষ বানাতে দেখেছিলাম। তার নাম পাঞ্চ।"

"হ্যাঁ, ট্রামগাড়ীতে কলকাতার কণ্ডাক্টাররা করে' থাকে আমি জানি।" ঘাড় নাড়ি আমি : "টিকিটের ওপর করে।"

"আরে, সে পাঞ্চ নয়, এ অন্য রকম। পাঁচরকমের বোতল থেকে একটু একটু করে' ঢেলে খুব নেড়েচেড়ে বানাতে হয়। খেলে নাকি হাতে হাতে স্বর্গ।...আমি খেয়ে দেখিনি, মানে, ফাঁক পাইনি চাখবার। মামাটা যা চালাক্, দেরাজে চাবি দিয়ে রাখত।"

"এখানে বলে গিয়ে এক রকমেরই পাওয়া যাচ্ছে না, সে পাঞ্চ এখানে হবে কি করে' শুনি?" ওর উচ্চাশায় আমি অবাক হই।

"এখানে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই বানানো যাবে। প্রোসেসটা আমার জানা আছে তো। ছাখ না, কী করি!"

খেজুরের রস হাঁড়িখানেক পাওয়া গেল, আর পতিত কোথ্‌থেকে খানিকটা তাড়ি জোগাড় করে' আনল। আমিও পেছুবার ছেলে নই, যতটা তাড়াতাড়ি পারি বিপৎকালে দোস্ত্‌কে সাহায্য করাই আমার দস্তুর। সুসময়ে যেসব বন্ধুর দেখা পাওয়া যায়, আর অসময়ে কেবল যাদের বন্ধুরতা দেখা দিতে থাকে তাদের অন্যথা বলেই চিরদিন নিজেকে আমি মনে করে' এসেছি। অতএব, আমার পিসেমশাই কী একটা টনিক খেতেন—যার শতকরা ত্রিশভাগ নিছক্ অ্যাল্‌কহল্‌ বলে' নোটিশ মারা ছিল—তার থেকে বেশ কিছুটা আমি সরিয়ে নিয়ে এলাম।

এই ত্র্যহস্পর্শের ওপরে আবার সিদ্ধি এসে পড়ল। সিদ্ধিলাভের ফলে উম্‌দা হয়ে পানীয়টা এতক্ষণে খাবার যোগ্য হয়েছে বলে' আমার ধারণা হোলো। বলতে কি, আমার একটু নেশাই লাগলো যেন। "চেখে দেখব নাকি একটু?" লালায়িত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"না না। এখন না। আগে অতিথি-সৎকার হোক্, তার পরে যদি থাকে তো আমরা।" পতিতেরও লালসা দেখা দিলেও সে আত্মসম্বরণ করতে জানে। মামার বাড়ী থেকে সেই শিক্ষা সে লাভ করে' এসেছে।

কিন্তু এ যা হয়েছে, এমন দেবভোগ্য জিনিস, অতিথিসেবার পরে আমাদের দেবার থাক্‌বে কিনা সন্দেহ হয়। আমি খুঁৎ খুঁৎ করি।

"কিন্তু যাই বলো এ তোমার সেই পঞ্চরং তো আর হোলো না,"—খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে একটা খুঁৎ ধরা পড়ে আমার কাছে—"চারটে জিনিস পড়ল কেবল। তবে একে চতুর্ব্বর্গ লাভ বল্‌তে পারো বটে। বল্‌তে গেলে তাও নেহাৎ কম নয়।"

"এক্ষুণি একে পাঞ্চ বানিয়ে ফেল্‌ছি, দ্যাখ্ না।" এই বলে' ওর বাবার লাল কালির বোতলটা ওর ভেতরে বেবাক্ ফাঁক করে ফ্যালে। —"এই নে তোর পঞ্চরং! হয়েছে এবার?"

হয়নি বলা কঠিন। কেননা পঞ্চত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে পানীয়র রং যা খুলেছিল, কী বলব! এমন কি, নিজেকে আমি জলচর দারোগার মতই সতৃষ্ণ বোধ করতে লাগলাম।

প্রায় কুঁজোখানেক সম্বর্দ্ধনা তৈরি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। দারোগাবাবুর বজরা পাড়ে এসে ভিড়েছে, পাহারোলা এসে খবর দিল। কেবল দারোগাবাবুর মজুদ্ হওয়াই নয়, সেই একই বজরায় তার নিজেরও যে আমদানি সেই খবর জানাতেও সে কসুর করল না।

যাক্, সম্বর্দ্ধনা যখন প্রস্তুত, তখন বজ্রাঘাতে আর ভয় কিসের? আমি আর পতিত নদীর দিকে দৌড়লাম। তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে আনতে হবে তো!

দারোগা এবং সার্কেলবাবু আপাততঃ নামবেন না, বজ্‌রাতেই থাকবেন জানালেন। দারোগাবাবু আরো জানালেন যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল যদি একটু পরিষ্কার—

আর জানাতে হোলো না। ওতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি পতিতকে চোখ ঠারলাম—যার সরলার্থ—কী! কী বলেছিলাম? প্রথম কথাই তেষ্টার কথা—দেখচ তো এখন? ঠ্যালা বোঝো!

কিন্তু ঠ্যালা বোঝার কিছু ছিল না তাই রক্ষে। কুঁজো বোঝাই পরিষ্কার হয়ে রয়েছে, কেবল তাকে ঠেলে নিয়ে আসতেই যা দেরি! "এক্ষুণি আন্‌ছি," বলে' দৌড় মারলো পতিত।

"ছেলেটাকে বলে' দেয়া হোলো না! আমার জন্যেও অমনি এক গ্লাস আনত।" সার্কেলবাবু বল্লেন। তাঁকেও বেশ তৃষ্ণার্ত্ত দেখা গেল।

"আপনি ভাববেন না। ও কুঁজোভর্ত্তি নিয়ে আস্‌বে।" আমি আশ্বাস দিই।

"শুধু জল আনলেই যথেষ্ট! আবার খাবার টাবার আনবার হাঙ্গাম্‌ না করে।" দারোগাবাবু মন্তব্য করলেন।

বল্‌তে বল্‌তে পতিত সেই কুঁজো ঘাড়ে (নিজে আরেক কুঁজো হয়ে) আর গোটা চারেক গেলাস হাতে এসে হাজির। সেই কুঁজো নিয়ে আমরা সবাই বজরার ভেতরে গিয়ে জড়ো হলাম। বেশ বড় গোছের বজ্‌রা। ভেতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা। শোবার, বসবার, নড়বার চড়বার কোনো অসুবিধা নেই।

বড়ো বড়ো দু গ্লাস টইটুম্বুর করে' দেয়া হোলো।

"একি! এ কী জিনিষ? সরবৎ নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন দারোগাবাবু।

পতিত তদুত্তরে কী বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বল্‌তে না দিয়ে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সরবতই বটে। ওই বানিয়েছে। ওর মামার কাছ থেকে শেখা এক রকমের এস্‌পেশাল্‌ সরবৎ।" পতিতকে চোখ টিপে বাধা দিয়ে আমিই সদুত্তর দিলাম—চোখ টেপার মানে হচ্ছে—ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে চলতে হয়, বলতে হয়, বুঝলি রে হাবা?

পতিত আমার ইঙ্গিত বুঝল, কোনো উচ্যবাচ্য করল না।

"স্পেশাল সরবৎ? তাই নাকি? তা রং দেখলে তাই মনে হয় বটে।" সার্কেল অফিসার সাগ্রহে গ্লাসটা তুললেন।

পাহারোলাও আড়াল থেকে একটা হাত বাড়ালো। সেও তো জলপথে এসেছে, তার বর্দ্ধনাই বা অসম হবে কেন? সেটা কি নেহাৎ অসঙ্গত হবে না? তার লোটাতেও একটু ঢেলে দেয়া হোলো।

বজ্‌রার মাঝি দুজনাও বেশ লোলুপ: "আমাদেরও একটু পেসাদ দেবেন বাবু।"

তাদেরকেও বাদ দেয়া যায় না। তাদের বদ্‌নাতেও বেশ খানিকটা দেয়া হোলো। এখন আমাদের পালা!—পতিত বলেছিল, অতিথি-সৎকার করে' বাকী থাক্‌লে—এবং সে বুদ্ধি করে' দুটো গ্লাস বেশীই এনেছিল—নিঃসন্দেহ উক্ত নিজেদের জন্যই। কুঁজোর ভেতরে বাকী কিছু আছে কিনা আমি উঁকি মারলাম।

"বাঃ, ফাস্‌ কেলাস্‌!" গেলাস ফাঁক করে' বলে' উঠলেন দারোগা।

"এমন সরবৎ এ জীবনে খাইনি!" সার্কেলবাবুরও গেলাস খালি। এবং খালি সাধুবাদ।

"বড়িয়া চীজ।" পাহারোলাও জানাতে দ্বিধা করল না।—"বড়ি বড়িয়া চীজ!"

"তোমরাও একটু খাও। কষ্ট করে করেছ।" দারোগা বল্লেন।

"হ্যাঁ, খাব বইকি সার্! খাচ্ছি এই যে।" আমি তাঁর সম্মতিতে সায় দিতে দেরি করি না।

পতিতও চট্‌পট্ আরো দু' গ্লাস ভর্ত্তি করে' ফ্যালে—তার এবং আমার গো-গ্রাসের উপযুক্ত দু' গ্লাস।

গ্লাস মুখে তুলতে গিয়ে দারোগার দিকে আমার নজর পড়ল। বজরার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—কিরকম যেন ঋজুভাবে দণ্ডায়মান মনে হোলো। সাধারণতঃ মানুষ, বিশেষ করে' দারোগা মানুষরা এভাবে দাঁড়ায় না, দাঁড়িয়ে আরাম পায় না। আমার পিসেমশাইকে প্রাণায়াম করবার কালে ওই ধরণে বস্‌তে দেখেছি। ওতে প্রাণায়াম হতে পারে, কিন্তু প্রাণের আরাম হয় না, পরীক্ষা করে' দেখা আমার। কিন্তু কোন্‌ঠাসা হয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—এ আবার কী প্রাণায়াম দারোগাবাবুর?

দারোগা বাবুর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, একেবারে কাঠ। নট্ নড়ন্ চড়ন্। নট্ কিচ্ছু! চক্ষু স্থির, কিন্তু দুই চোখ দিয়ে কী অনির্ব্বচনীয় মধুবৃষ্টি হচ্ছে—এমন প্রাণকাড়া চাউনি দেখা যায় না! আর সারা মুখে যা অপার্থিব আহ্লাদ। পুলক যেন থৈ থৈ করছে!

সার্কেলবাবুর দিকে তাকালাম। তাঁরও তদ্‌গত ভাব, তথৈবচ অবস্থা। আত্মহারা হয়ে তিনি বসে' পড়েচেন। এইটুকুই তার বাহুল্য। আমার হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ল। পতিত মুখে তুলতে যাচ্ছিল, ঘুষি মেরে তার গেলাসটা আমি খসিয়ে দিলাম।

"কী সর্ব্বনাশ!" আমি আর্ত্তনাদ করে উঠেছি—"এতগুলোকে তুমি খুন্ করলে?"

"দূর্! তাকি হয়?" বলল পতিত—কিন্তু তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা।

"পাহারোলাটার দিকে তাকাও!" আরেক দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কিন্তু সত্যি বল্‌তে, তার পানে তাকানো যায় না। মাঝিগুলোর তো হুঁস নেই, বজরার মাঝেই তারা কাৎ। কেবল পাহারোলাটা তখনো যুঝচে। বোধহয় ওই পঞ্চ রংয়ের এক রং—সিদ্ধিটা একরকম রপ্ত ছিল বলেই এখনো কিছুটা জ্ঞান-গম্যি ওর রয়ে গেছে।

আনন্দে গদ্‌গদ ভাব নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে আস্‌ছিল।

"তোমাকে গেরেপ্তার করতে আস্‌চে বোধহয়।" আমি বল্লাম।

পতিত নিরুত্তর—নিষ্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে। আর একটু এগিয়ে অভিন্নদশা লাভ করে পাহারোলাও বজ্‌রা নিল।

"একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেচো—পাহারোলাটাকেও খাইয়ে দিয়ে।" আমি বলি, "তা না হলে এতক্ষণে আমাদের হাতে হাত-কড়া পড়ে যেত। নদীর এধারটায় বড় কেউ আসে না সেটাও এক বাঁচোয়া। চলো এবার ভালোয় ভালোয় সরে পড়ি। পালিয়ে যাই এখান থেকে।"

আমার কথায় কাণ না দিয়ে পতিত দারোগাকে ধরে ঝাঁকুনি দেয় —"দারোগা বাবু! ও দারোগা বাবু!"

বাতাহত কদলীকাণ্ডবৎ বলে' একটা কথা আছে না? পতিতের বাৎ শুনে আর ঝাঁকুনি খেয়ে দারোগাবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে প্রায়

সেইরকম করে' পড়তে যাচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে আমি বাধা দিলাম—তাঁর আর সে কাণ্ড করা হোলো না। ধরে ফেলে ফের তাঁকে সেই বজরার গায়ে ঠেক্‌নো দিয়ে রাখলাম। আর তিনি স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন—তাঁর ভাববিহ্বল প্রশস্ত মুখ নিয়ে।

তারপর একে একে বাকীদেরও নেড়ে চেড়ে দেখা হোলো—কারো বেলা কোনো ব্যতিক্রম নেই। হালের মাঝি থেকে পাহারোলা পর্য্যন্ত সবার এক হাল। সবাই সমান নিস্পন্দ—সবার মুখেই সেই দেবদুর্ল্লভ বোকা হাসি।

"তোমার পাঞ্চের জন্যেই এই রকম হোলো।" আমি বল্লাম।

পতিত কিছু বল্ল না, প্রত্যেকের বুকে কান পেতে শুন্‌তে লাগল।

পাঞ্চের জন্য হোলো বটে, কিন্তু পাঞ্চের কোন্‌টার জন্য হোলো, আমি ভাবি। ওর মধ্যেকার কতকাংশ দায়িত্ব আমারো ছিল তো। সেই টনিকটার থেকেই এই টনিক এফেক্ট কিনা কে জানে। না কি, বোতলের সেই লাল কালিই শেষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে? ভাবতে হয়।

"না না, প্রাণ আছে!" বল্ল পতিত: "ধুক্‌ধুক্‌ করছে বুক। নিশ্বাস পড়ছে সবার—খুব আস্তে আস্তে যদিও—তবুও বেঁচে আছে সবাই।"

"কিন্তু কতোক্ষণ আর থাক্‌বে সেই হচ্ছে কথা।" আমি বলি: "তোমার পাঞ্চের জন্যই—"

"তোমার পাঞ্চজন্যনিনাদ থামিয়ে কি করে' এদের চৈতন্য ফেরানো যায় সেই চেষ্টা একটু দেখবে?" ধমক্‌ দিল পতিত।

মহাপ্রস্থানোন্মুখ পাণ্ডবদের দিকে তাকালাম—যেন কয়েকটি মোমের পুতুল! প্রত্যেকের মুখে প্রসন্ন দিব্য ভাব! যেন এই জীবন এবং এই পৃথিবীর প্রতি কারো কোনো আসক্তি নেই। সবাইকে মার্জ্জনা করে' মার্জ্জিত হয়ে সশরীরে স্বর্গলাভ করে' বসে' আছেন সবাই!

অজ্ঞানাচ্ছন্নকে চৈতন্যদানের যতগুলি পদ্ধতি জানা ছিল—গালে চড় মারা থেকে সুরু করে' গা হাত পা টিপে দেয়া তক্—কিছু বাকী রইলো না—এমন কি, একজন জলেডোবা লোককে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দানের যে কৌশল একদা দেখেছিলাম তাও পরীক্ষা করতে কসুর করা হোলো না—কিন্তু সমস্তই বৃথা হোলো!

শেষ পর্য্যন্ত পতিত দারোগার পায়ে একটা আল্‌পিন্ ফুটিয়ে দিলে—আর কোনো উপায় না দেখে। কিন্তু তথাপি তিনি মিষ্ট হাসি হাসতে লাগলেন।

"আর কোনো পথ নেই। ডাক্তার ডাকো এবার।" আমি বল্লাম।

"হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকি আর সাধ করে গলায় ফাঁসি পরি—মাইরি আর কি? বন্ধু ছাড়া এমন সদুপদেশ কে দেবে?" পতিত আমার দিকে রোষকষায়িতনেত্রে তাকালো: "কিন্তু ভাই, ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই, ভয় করেনা একটু, কিন্তু বাবা যে ফিরে এসে প্রথমেই একচোট্ ঠ্যাঙাবে সেই কথাই আমি ভাবছি।" পতিতকে প্রায় কাঁদো কাঁদো দেখা গেল।

"আচ্ছা, আমি বলি কি, বজ্‌রার তলায় ছ্যাঁদা করে' বজ্‌রাসমেত ডুবিয়ে দিলে কেমন হয়? অবশ্যি, এখন না, এরা সব মারা গেলে তার পরে—মারা তো যাবেই।" আমি ভরসা দিই।

"নদীর কূলে কখনো বজ্‌রা ডোবে? ডোবালেও মাথার দিকটা উঁচু হয়ে জেগে থাকবে।" পতিত জানায়।

"আহা, এখানে কেন? নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে, আমি আবার সাঁতার জানিনে।"

"আমি জানি।" পতিত বলে এবং প্রস্তাবটা ভুরু কুঁচকে ভালো করে' তলিয়ে ছাখে—"হ্যাঁ, তাহলে বোধহয় মন্দ হয় না। এতক্ষণে একটা বন্ধুর মত উপদেশ দিয়েছিস্ বটে। হ্যাঁ, তাহলেই ব্যাপারটা একদম্ চুকে যায়—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। সাক্ষী সাবুদ কিচ্ছু থাকে না। তুই সাঁতার জানিস্‌নে—বল্‌ছিলিস্ না?"

প্রস্তাবটার অসুবিধার দিকটা আরো ভালো করে' আমার নজরে পড়ে এবার। কী জবাব দেব ভেবে পাইনে।

"ভয় খাস্‌নে তুই! আমি তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। আমি তো সাঁতার জানি!" পতিত অভয় দেয়।

ও যা আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে তা মা মহানন্দাই জানেন—আমারো আর জানতে বাকী থাকে না।

তখন আমাকে অন্য এক সদুপায় বার করতে ঘোরতরভাবে মাথা ঘামাতে হোলো।

"ওদের যদি কোনো রকমে বমি করানো যায় তাহলে পেটের ওই সব বেরিয়ে গিয়ে বেহুঁস্ অবস্থাটা কেটে যেতে পারে।" আমি বলি: "ঘুর্‌পাক্ খাওয়ালে হয় না?"

কথাটা পতিতের মনে লাগে। আর তক্ষুণি তক্ষুণি ও কাজে লেগে যায়। হুটো বিছানার চাদর বজরার হুদিকে খাটানো হয়—চাদরের চারটে খুঁট দড়ি দিয়ে শক্ত করে' খুঁটোর সঙ্গে লাগিয়ে ফ্যালে।

"এইবার দোল্‌নার মতো হোলো না? কি বলিস্? এবার ওদের একে একে এতে চাপিয়ে খুব কষে ঘুর্‌পাক্ খাওয়ানো যাক্। মনে হচ্ছে এতেই হবে।" পতিত মনস্তাত্ত্বিকের মত মুখখানা বানায়।

"আগে দারোগা আর সার্কেলটাকে তোল্—ওগুলোর ব্যবস্থা পরে।" পতিত ওদের অঙ্গে বাবুর যোগ করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করে; কাবু অবস্থায় স্বভাবতঃই তখন কারো বাবুত্ব ছিল না।

দারোগা দাঁড়িয়েই ছিলেন—বোধহয় দোল্‌নায় চাপার অপেক্ষাতেই। আমি আর পতিত দুজনে ধরাধরি করে' তাঁকে দোল্‌নায় তুলে শুইয়ে দিলাম। সার্কেল্ বজরার মেজেয় ততক্ষণে ষ্ট্রেট্ লাইন্ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকেও ধরে' তোলা হোলো।

"ব্যস্, এবার দে ঘুরপাক্—নাগর দোলায়।" এতক্ষণে পতিতের একটু উৎসাহ দেখা দেয়।

ঘণ্টাখানেক ধরে' দোললীলা চল্‌ল। খানিকক্ষণ একে দোলাই, তারপর লাফিয়ে গিয়ে ওকে দোল দিতে হয়। দোলানোর চোটে গা আড়পাড় করে' আমার পেটে যাকিছু ছিল সব গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

"ফল দেখা দিয়েছে।" বল্‌ল পতিত। বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গেই বল্ল।

নবোদ্যমে লাগা গেল আবার। আরেক ঘণ্টা ঘূর্ণীপাকের পরে এবার পতিত বমি করে' বস্‌ল।

আমি কিছু বল্লাম না। শুধু চেয়ে দেখলাম।

"এতক্ষণে আমার সত্যিই একটু আশা হচ্ছে।" পতিত নিজেই জানালে।

আমার কিন্তু আশাপ্রদ কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না। দারোগার মুখের মিষ্ট হাসি অবশ্যি মিলিয়ে এসেছিল, মাঝে মাঝে তিনি ভ্রূভঙ্গী

করছিলেন এবং কেমন যেন একটা কাতরভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর আননে—কিন্তু হলে কি হবে, বমন করার কোনো আগ্রহ সেখানে নেই। সার্কেলবাবুর লক্ষণও সুবিধেজনক বোধ হোলো না।

চল্‌লো ঘুরপাক্। খানিক পরে দারোগা বাবু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। তাঁকে নড়তে-চড়তে দেখা গেল।

"এই! দেখ্‌ছিস্ কি? চট্ করে' এগুলো সরিয়ে ফ্যাল্।" পতিতকে ইসারা করতেই সে কুঁজো, গেলাস—স্পেশাল্ সরবতের যাকিছু মাল মশলা সব—নদীগর্ভে জলাঞ্জলি দিল। প্রমাণ কখনো রাখতে আছে? আর রাখলেও, দারোগার কাছাকাছি রাখা ঠিক নয় নিশ্চয়ই?

আস্তে আস্তে দারেগাবাবু অতিকষ্টে দোলনার মধ্যে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। "আমি···এ কোথায়···আমার কী হয়েছে?" তাঁর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল।

"আপনার অসুখ করেছে।" উচ্চকণ্ঠে বল্‌লে পতিত।

"অসুখ? কী অসুখ করল?···আমি এরকম করে' শুয়ে কেন? এভাবে কে আমাকে শোয়ালে? এতো আমার বিছানা নয়।"

"আজ্ঞে, জলপথে যে অসুখ করে' থাকে সেই অসুখ।" আমি জানালাম: "যার নাম সী সিক্‌নেস্। সামুদ্রিক পীড়া—তাই আপনার হয়েছে।"

"আর এরকম ব্যামো হলে যে রকম করে' শোয়ানো নিয়ম সেই ভাবেই আপনাকে রাখা হয়েছে।" পতিত বলে দিল।

বজ্‌রার ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে মহানন্দাকে তাঁর মহাসমুদ্র বলে ভ্রম হোলো কিনা জানিনে, কিন্তু মেজেয় তাকিয়ে সামুদ্রিক পীড়ার

যাবতীয় লক্ষণ চাক্ষুষ প্রমাণের মতো চারিধারে ছড়াছড়ি দেখলেন এবং সেই দৃশ্য দেখে আবার তাঁকে বমি করতে হোলো।

তখন একেবারে নিজের সম্মুখেই হাতেনাতে তিনি প্রমাণ পেলেন।

প্রমাণের সঙ্গে প্রমাণ যোগ করা, মিলিয়ে দেয়া এবং খাপ খাওয়ানো দারোগাদের চিরকেলে পেশা। বদ্ধমূল স্বভাব। কাজেই এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না।



আমার প্রথম লেখা



কেন এ পথে এলাম!

সব পথিকের মনেই—চিরদিনের এই প্রশ্ন! কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে!' নিয়তি কি কেন-র বাধ্য?

স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সাহিত্যিক হওয়া মানে, সহজ পথ পরিত্যাগ করা। সেটাকে অসাধারণ কিছু হওয়া বলে' মানতে আমি প্রস্তুত নই। ক্ষয়রোগ পাওয়া কি অসাধারণ কোনো লাভ? তেমনি লেখকপনার অক্ষয়রোগীরা সাধারণ লোকের অতিক্রম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

প্রথম পদস্খলনের মতো কারো প্রথম গল্পলেখাকে একটা দৈব দুর্ঘটনাই বলতে হয়। এবং পথভ্রষ্টকে ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে সেই প্রাথমিক হঠকারিতাই যথেষ্ট। কেন যে আমি এই বিপথে এলাম এবং কি করে' এলাম—এই লেখাটি তারই কাহিনী! আমার সেই প্রথম গল্পরচনার জন্মবৃত্তান্ত।

আর সকলের মতো, আমার প্রথম গল্পও অতি কাঁচা বয়সের কাণ্ড! একেবারে ছোটবেলার। আর তার শ্রোতা এবং সমঝদারও মাত্র এক-জন। স্বভাবতই তিনি—মা।

—"তুমি জিনিষ কিনতে যে দুয়ানিটা দিলে মা, সেটা কোথায় যেন পড়ে গেল!"

এই কথা মা-কে যেদিন প্রথম বলেচি, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলতে পেরেচি, বলতে গেলে আমার প্রথম গল্প ঠিক তখনকারই রচনা।

অবিশ্যি, ধরতে গেলে, আমার প্রথম গল্পশোনাও মার মুখ থেকে।

অতএব মাকেই নিজের গল্প শোনানো—কিছুটা প্রতিশোধ-স্পৃহার থেকে প্রণোদিত—তাও হয়ত বলা যায়।

তবে বাল্যকালের লেখা এবং পরকালের লেখায় পার্থক্য আছে। দুইই পড়বার জিনিষ—প্রথমটা চাপা আর পরেরটা ছাপা। এই চাপা পড়া লেখাদের সমাধিস্তূপ থেকে ছাপা-পড়া লেখাটির আবির্ভাবের মধ্যে ব্যবধান থাকে—সময়ের ব্যবধান। প্রথম রচনা আর প্রথম প্রকাশনা এই উভয়ের মধ্যে অনেক ফারাক্। এবং ফাঁড়া অনেক।

আমার প্রথম প্রকাশিত লেখা কিন্তু গল্প নয়। তা হচ্ছে কবিতা, বলাই বাহুল্য। এমন একটা বয়স আছে যখন কবিতারা ঠিক দাড়ির মতই আপনা থেকে বেরিয়ে আসে। কবিতা আর দাড়ি, বলতে কি, প্রায় এক সঙ্গেই সুরু হয়। অযাচিত এসে যায়—সেই প্রথম বয়সটায়। কিন্তু গল্প (মানে, রীতিমত গল্প) তখন কিছুতেই আসে না।

গল্পকে আনা ভারী দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে কোনো বয়সেই অনেক টেনে হিঁচড়ে তাকে আনতে হয়। গল্পরা তো কবিতার মত, কিংবা দাড়ির মত, নিজের ভেতর থেকে আপন প্রেরণায় গজিয়ে ওঠে না, তারা ছড়িয়ে থাকে মানুষের জীবনের পাতায় পাতায়। আপনার আমার—এর ওর তার—জীবনের পৃষ্ঠায় তার সমাবেশ। সেখান থেকে তাদের দেখে শুনে বেছে চুনে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হয়। তারপর নিজের পছন্দসই পোষাকে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রকাশযোগ্য করে' বার করতে হয় সবার সামনে।

প্রথম বয়সে গল্প সাজানো এক দারুণ সাজা। কেবল গল্পের

পক্ষে নয় লেখকের পক্ষেও ; এবং সে গল্প যদি পাঠককে পড়তে হয় তাহলে তার পক্ষেও কিছুমাত্র কম না। আমার প্রথম গল্প কতদিন আগেকার লেখা আমার মনে নেই, কিন্তু সে যে কত কষ্ট করে লেখা তা এখনো আমি ভুলতে পারিনি। আমার সেই প্রথম গল্প লেখার গল্পই আপনাদের এখন বলতে যাচ্ছি।

আপনারা আমার গল্প পড়েছেন কিনা জানিনে। যদি ভুলক্রমে এক আধখানা কখনো উল্‌টে থাকেন তাহলে হয়ত আপনাদের মনে হয়েছে স্রেফ গাঁজা। কারো কারো এরূপ মনে হয়, এবং কেবল মনে হওয়াই নয়, মুখ ফুটে একথা কেউ কেউ অকপটে ব্যক্তও করেন। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রায় সব গল্পই সত্য ঘটনা ; এই জীবনে, হয়ত এই অধমকে নিয়েই দুর্ঘটিত ; এবং তার কোনটাই গাঁজা নয় ; হয়ত বা কোথাও একটু অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাহলেও তা আমার এই মুষ্টিমেয় জীবন থেকে গাঁজানো।

আমার প্রথম গল্পটাও ঠিক এইভাবেই অকস্মাৎ আমার জীবন থেকে গেঁজে উঠেছিল। জীবন থেকে গল্প গেঁজে ওঠা যে কী ব্যপার তা এই কাহিনী শুনলেই আপনারা টের পাবেন। আমার গল্পরা যখন রূপান্তরিত হয়ে সেজে গুজে আপনাদের সমক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের দেখে হয়ত হাস্যকর বলে মনে হলেও হতে পারে কিন্তু যখন আমার সামনে বা আমার আশেপাশে, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে, গাঁজতে থাকে তখন তা দস্তুরমতই গঞ্জনাদায়ক। মোটেই হাস্যকর নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তো নয়। জীবনকে, এই জন্যেই বুঝি অনেকে ট্র্যাজিডি বলে থাকেন। তাঁরা মিথ্যা বলেন না। আমার

জীবনের ট্র্যাজেডিগুলো গল্পাকারে লিখতে গিয়ে, লেখার দোষে কিম্বা লেখকের অক্ষমতায় হয়তো হাস্যকর হয়ে দেখা দেয়—কিন্তু তা পড়ে আপনাদের হাসি পেলেও, আমার গল্প পড়ে আমার নিজের কখনো —কদাচই—হাসি পায় না।

আমার এই প্রথম গল্পটাও ঠিক এমনি করেই গজিয়েছিল। শুনুন তাহলে। সেদিন ছিল পয়লা বোশেখ। কলম নিয়ে বসে কী লিখি কী লিখি করছিলাম। কিছুই আসছিল না কলমে! নিজেকে নিজ মনে বলছিলাম, গল্প হচ্ছে জীবন-দর্শন, জীবনকে কোথায় কিভাবে দেখেছো মনে করো, ভেবে ভেবে ছাখো, তারপরে তার মধ্যে একটু দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্যাজাল মিশিয়ে লিখে ফ্যালো। লোকচক্ষে এনে বার করা তার পরের কথা। বলি, জীবনের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?

যতবারই এই প্রশ্ন তুলি ততবারই জীবনবাবু বলে এক ব্যক্তির ছবি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। সখ কিম্বা পেশা কে জানে, বাড়ী বাড়ী ঘড়ির দম দিয়ে বেড়ানোই ছিল এই জীবনবাবুর কাজ। তাঁকেই আবার ফিরে মনশ্চক্ষে দেখি, আসল জীবনের আর দেখা পাই না।

অবশেষে বিরক্ত হয়ে কলম ফেলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম। সামনেই পড়েছিল রিসিভারটা, আমার টেবিলের এক-কোণে। এবং সেই মুহূর্ত্তেই জীবনের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। আমার প্রথম জীবনসাক্ষাৎ! আর সেই ঘটনা (কিম্বা দুর্ঘটনা) থেকেই আমার প্রথম গল্প গেঁজে উঠলো। সাক্ষাৎ জীবনী থেকে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে এল গল্পটা!—

কিন্তু এখন কাকে ফোন করি? টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম। আজ সম্বচ্ছরের প্রথম দিন—কাউকে ডেকে নতুন বছরের সাদর সম্ভাষণ জানালে কেমন হয়!

কিন্তু কাকে জানাই? কাকে আবার? যাকে তাকে, যাকে খুশী তাকেই। আজকের দিনে কে আপনার, কেইবা পর? একধার থেকে ডেকে ডেকে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিই। সেই কি ঠিক হবে না?

টেলিফোন ডিরেক্টরী নিয়ে নাড়াচাড়া করি। অসংখ্য নাম! নম্বরও বহুৎ! কোন ধার থেকে সুরু করব?

চক্রবর্ত্তীদের নিয়েই আরম্ভ করা যাক্ না? চ্যারিটি বিগিন্‌স্ য়্যাট্ হোম্। তাছাড়া বঙ্কিমবাবুও বলে গেছেন—। কী বলে গেছেন? না, চক্রবর্ত্তীদের সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলেননি, তবে চক্রবর্ত্তীদের সম্বন্ধেও সেকথা বলা যায়। একটু ঘুরিয়েই বল্‌তে হয়, বলতে গেলে। হ্যাঁ,—চক্রবর্ত্তীকে চক্রবর্ত্তী না ডাকিলে কে ডাকিবে?

অতএব একে একে চক্রবর্ত্তীদের ধরে ধরে ডেকে যাই। এবং মিষ্টি করে নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। আমার দ্বারা তাদের চক্রবর্ত্তীসুলভ যৎকিঞ্চিৎ জীবনে কিছু কিছু আরামের আমদানি হোক। ক্ষতি কি?

কিন্তু চক্রবর্ত্তীও খুব কম নেই। তারাই দেড় গজ জুড়ে আছে ডিরেক্টরীর। কলকাতার ফুটপাত হতে পারে, কিন্তু টেলিফোনও যে এমন চক্রবর্ত্তী-বহুল এ আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক্, প্রথম একটা চক্রবর্ত্তীকে পছন্দ করলাম, এবং টেলিফোনটা কাছে এনে

রিসিভারটা তুলে ধরলাম,—যথারীতি নম্বর বলা হোলো। অনেকক্ষণ ধরে কোনো সাড়াশব্দই নেই। হালখাতায় বেরিয়ে গেছেন নাকি ভদ্রলোক? য়্যাতো বেলা থাকতেই? বিচিত্র নয়, চক্রবর্ত্তীরা যেরূপ মিষ্টান্নলোলুপ আর উদর-হৃদয়, অবাক্ হবার কিছু নেই।

বহুক্ষণ বাদে একটা আওয়াজ এলো। মাছের মুড়ো মুখে করে কে একজন কথা বল্‌ছে বোধ হোলো আমার। "রং নম্বর! রং নম্বর! রং নম্—" বলতে বলতেই নিরুদ্দেশে মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ!

ভারী বিরক্তি লাগে। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাতে বসে মন্দ না। ভাব জমাবার গোড়াতেই আড়ি! দূর্ দূর!

রিং করতে সুরু করি ফের!

আওয়াজটা আবার ঘুরে আসে—এসে জানায়: "নাম্বার এনগেজড।"

এবং এই বলেই আবার সেটা উধাও হবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। "শুনুন মশাই, শুনুন!"—উপরচড়াও হয়ে আওয়াজটাকে পাকড়ে ফেলি।

"বলুন! বলুন তাহলে!" আওয়াজটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে মনে হয়।

"আপনিই শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী?" আমি বলি।

"না—!" মেগাফোন-বিনিন্দিত কণ্ঠে উনি জবাব দিলেন।

"আপনি—আপনি কে তবে?"

"এই! এই ঠাকুর! ইলিশ মাছের রোস্‌ট কই আমার? রোস্‌ট? —যাও, নিয়ে এসো জল্‌দি! য়ঁ্যা, কী বল্‌ছেন? আমি? আমি কে? বলেছি তো আমি রং নম্বার! তার ওপরে, আমি এখন এনগেজড।"

তারপর আর কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। কিন্তু আমিও সহজে পরাস্ত হবার পাত্র না। আমার আরেক ডাকাতি সুরু হয়। এ-বেচারি এখন নাচার—রোস্‌ট্‌লেস্‌ বলেই হয়ত রেস্‌টলেস এবং চক্রবর্ত্তীও হয়তো নয়। দেখে শুনে দ্বিতীয় এক চক্রবর্ত্তীকে ডাক দিই।

"আপনিই কি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী ?"

"হ্যাঁ, আপনি কে ?"

নিজের নাম বল্‌লাম।

টেলিফোনের অপর-প্রান্তবর্ত্তী সশব্দে ফেটে পড়্‌লেন—

"আপনাকে তো আমি চিনি না মশাই। নামও শুনিনি কক্ষনো! আমার কাছে কী দরকার আপনার ?"

"আজ্ঞে, দরকার এমন কিছু না। এই কেবল আপনাকে আমার নমস্কার—অর্থাৎ—এই নববর্ষের—"

"কে হে বদ্‌ ছোকরা ? ইয়ার্কি দেবার আর জায়গা পাওনি ? আধঘণ্টা ধরে রিং করে অনর্থক বাথরুম থেকে টেনে আন্‌লে আমায় ? এখন ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি হবে, সর্দি বসে গিয়ে ব্রংকাইটিস্‌ হবে। তার পরে নিউমোনিয়া হয়ে নিমতলা হয় কিনা কে জানে! হায় হায়, তোমার মত গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে অবশেষে আমি বেঘোরে মারা পড়লাম।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনেকশন কেটে দিলেন, নববর্ষ অবধি হয়ে থাকলো, সাদর সম্ভাষণটা ভালো করে জানাবার ফুরসৎটুকুও পাওয়া গেল না! সে অবকাশ তিনি দিলেন না আমায়।

আবার ডাক দিতে হোলো ভদ্রলোককে। দুঃখের সহিত, সেই বাথরুম থেকেই টেনে আন্‌তে হোলো আবার। কী কর্‌ব? কোনো কাজ অসমাপ্ত কিম্বা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখা ঠিক নয়। সেটা চকর্‌বর্‌তিদের কাজ না। বিশেষ করে' আজকের দিনে কারো সঙ্গে—নতুন বছরের প্রথম খাতির জমাতে গিয়ে অখ্যাতি-লাভটা যেন কেমন—!

"আপনিই মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?"

"আলবৎ! আমিই সেই! তুমি কোন্ বেয়াক্কেলে?"

"আজ্ঞে, আমি—আমি—" আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌তে যাই।

"একটু আগেই তো আমার জবার দিয়েছি, আবার কেন? আচ্ছা ত্যাঁদোড় তো!—"

এই বলে সশব্দে তাঁর রিসিভার ত্যাগ করলেন, স্বকর্ণেই শুন্‌তে পেলাম। আমাকে পরিত্যাগ করে আবার বাথরুমেই প্রস্থান করলেন বোধ হয়। নাঃ, উনি ওঁর জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করতে উৎসুক নন্। অন্ততঃ, আপাতত যে নন্, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

তালিকার তৃতীয় ব্যক্তিকে ধরে টানি এবার।

"শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী আপনি?"

"ঠিকই ধরেছেন। আপনি কে?"

"আজ্ঞে, আমিও আরেক শ্রীযুত—আজ্ঞে হ্যাঁ, চক্রবর্ত্তীই।" যুতসই হয়ে জানিয়ে দিই।

"ও, তাই নাকি?" চোখা গলায় বল্‌তে সুরু করেন তৃতীয় ব্যক্তি:

"দুহপ্তা ধরে' আমি গরু খোঁজা করছি আপনাকে। সেই যে আপনি কেটে পড়লেন দালালির টাকাটা মেরে—তারপর আপনার

আর কোনো পাত্তাই নেই। আচ্ছা লোক আপনি যাহোক! আপনার আক্কেলকে বলিহারি!”

আমি একটু বিব্রত বোধ করি। সাদর সম্ভাষণের পূর্ব্বেই একজন অপরিচিতের কাছ থেকে এতটা মোলায়েম অভ্যর্থনা—এমন সাগ্রহ হাপিত্যেশ আমি প্রত্যাশা করিনি। বিশেষ করে একটু আগেই, দু'দুটো সংঘর্ষ সামলাবার ঠিক পরেই। আমি তো কেবল সম্ভাষণ করেই সারতে চাই, এবং সরতে চাই। তারপরে আর কিছুই চাই না। কিন্তু ইনি তো দেখছি তারও বেশি অগ্রসর হতে উদ্‌গ্রীব। যেভাবে—যেরূপ গোরুতরভাবে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন, বল্‌লেন, তাতে হয়তো এর পরেও রীতিমত ঘনিষ্ঠতা জমাবার পক্ষপাতী বলেই তাঁকে মনে হয়।

আমার তরফে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হতে বিলম্ব হয়, স্বভাবতঃই একটু সময় লাগে।

“একি! চেপে গেলেন যে একেবারে?”—অন্য তরফে ততক্ষণে সম্ভাষণের দ্বিতীয় পালা সুরু হয়ে গেছে: “বেশ ভদ্রলোক আপনি! দালালির টাকাটা তো অক্লেশে মেরে নিয়ে যেতে পারলেন, কিন্তু এই পচা বাড়ীতে কোনো মানুষ বাস করে? এঁদো, ড্যাম্পো, মশার আড্ডায়, কাঁকড়া বিছের সঙ্গে থাকতে পারে কেউ? এরকম বাড়ী আমাদের ভাড়া গছিয়ে এভাবে ঠকিয়ে কী লাভ হোলো আপনার শুনি?” তিনি জবাবদিহি চান্‌।

কী জবাব দেব? এবার আমাকেই কনেকশন কাট্‌-আপ করতে হোলো, সম্বন্ধ বজায় রাখা আর সম্ভব হোলো না। দফায় দফায় কারো রাহাজানি চল্‌লে তার সঙ্গে রফা করে' নিজের দফারফা করা

আমার মত সুরাহাবাদীর রপ্ত নয়। কাজেই, বিদায়-সম্ভাষণ না করেই সাদর সম্ভাষণ স্থগিত রাখতে হোলো—বাধ্য হয়েই—কী করব?

এবার চতুর্থ ব্যক্তির উদ্দেশে ডাক ছাড়ি। এবং তাঁকে কাছাকাছি পাবা মাত্রই আর অন্য কথা পাড়তে দিই না, সর্ব্ব-প্রথমেই আমার কাজ সেরে নিই :

"শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী! আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাই! নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ!..."

কাঁদো কাঁদো জবাব আসে : "তা জানাবে বৈকি! তা না হলে বন্ধু? তা না জানাবে কেন? আজ তো তোমাদেরই সুখের দিন হে, তোমাদেরই ফুর্ত্তি! এতদিনে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, পরশু মামলায় হেরেছি, কাল শ্বশুরমশাই আত্মহত্যা করেছেন, আর আজ সকাল থেকে যতো কাবলেওলায় ছেঁকে ধরেছে, আগামীকাল আমাকে দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হবে, আজই তো তোমাদের মত হিতৈষিদের আনন্দ উথলে ওঠবার দিন! আবার সর্ব্বনাশ না হলে আর তোমাদের পৌষমাস ফলাও হবে কি করে'?"

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হতে থাকে।

এ ব্যক্তিকেও, এই চক্রবর্ত্তীটিকেও, বরখাস্ত করে দিই তৎক্ষণাৎ। যেরকম বুঝছি, সব দিক থেকেই আমার সাদর সম্ভাষণের একদম্ অযোগ্য বলেই এঁকে মনে হচ্ছে। নববর্ষের জন্যে একেবারেই ইনি প্রস্তুত নন। অতঃপর, পঞ্চম চক্রবর্ত্তীকে বেশ একটু ভয়ে ভয়েই ডাক্‌তে হয়।

সাড়া দিতে না দিতেই সম্ভলব্ধ চক্রবর্ত্তী মশাই আরম্ভ করেন— "বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। গলা পেতেই চিনেছি। তা, সুদটা দিচ্ছেন কবে? আসল দেবার তো নামটি নেই। কতো জমে গেল খেয়াল আছে? য়্যাঁ? একেবারে উচ্চবাচ্যই নেই যে! ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, কিন্তু তোমার মতন এক নম্বরের এমন জোচ্চোর আর একটাও চোখে পড়ল না! একবার যদি সামনে পেতাম—মেরে পস্তা ওড়াতাম তোমার।"

আর বেশী শোনবার আমার সাহস হোলো না। পস্তায়মান এই ধারদাতার ধারালো ধাক্কায় আমি আঁধার দেখলাম। তা ছাড়া—সামান্য একজন, সাধারণ একজন চক্রবর্ত্তীকেই আমি ডাকতে চেয়েছিলাম, কোনো রাজচক্রবর্ত্তীকে না।

রিসিভার নামিয়ে অনেকক্ষণ কাহিল হয়ে থাকি।

তারপর বিস্তর ইতস্তত করে ষষ্ঠব্যক্তির জন্য রিসিভার তুলি—! কথায় বলে, বার বার তিনবার। আবার তিনে শত্রুতাও হয়, বলে' থাকে। অতএব কার্য্যতঃ, তিনবারের ডবল করেই—তবেই ছাড়া উচিত—

"হ্যালো, আপনি কি শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী? ও, আপনি? নমস্কার! আমি? আমিও একজন চক্রবর্ত্তী—! আপনারই সগোত্র নগণ্য একজন। হ্যাঁ, নমস্কার! আজ নববর্ষের প্রথম দিনটিতেই আপনাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি! সাদর সম্ভাষণ—আজ্ঞে হ্যাঁ!"

অন্য তরফ থেকে অন্যতর চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—বেশ গদ্‌গদস্বরে। মোলায়েম আর মিহি হয়ে। এ-চক্রবর্ত্তীটিকে অন্যান্য

চক্রবর্ত্তী থেকে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। বঙ্কিমবাবুর কথাটা রকমফের হয়ে এঁরও যেন জানা আছে মনে হচ্ছে।

তিনি বল্‌তে থাকেন—"ধন্যবাদ। হঁ্যা, কী বল্লেন? নামটা তো বল্লেন, কিন্তু আপনার ঠিকানাটা? একশো চৌত্রিশ নম্বর, বেশ বেশ! রাস্তার নাম?...বাঃ! নাম ঠিকানায় কবিতা মিলিয়ে হরিহরাত্মা হয়ে আছেন দেখছি—বাঃ—বাঃ! এই তো চাই। ছেলেপিলে কটি? আপনিই একমাত্র? তার মানে? ও—এখনো বিয়েই হয়নি? হবার আর আশঙ্কাও নেই? তা না থাক্। মানুষ আশাতেই, এমন কি, আশঙ্কা নিয়েও বেঁচে থাকে। বয়েসটা কতো বল্লেন? আন্দাজ করা একটু কঠিন? আটাশ থেকে আটাশীর মধ্যে? তাহলে—তাহলেই চলবে। এত কথা জিজ্ঞেস করছি কেন? এক্ষুনি জানতে পারবেন, আমি যাচ্ছি আপনার কাছে। না না, কোনো ঘটকালি নয়। তবে আপনি যেমন আমাকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করলেন, তেমনি আজ নববর্ষের প্রথম দিনে একটা ভালো কাজ আপনার জন্যও আমি করতে চাই। আপনার জীবনবীমাটা আজই করে ফেলুন। জীবনবীমার দ্বারাই জীবনের সীমা বাড়ানো যায়। অতএব, শুভকাজ দিয়েই বছরের প্রথম শুভদিনটা আরম্ভ হোক্! কেমন?...দাঁড়ান, এই দণ্ডেই আমি যাচ্ছি।"

এই প্রত্যুত্তরলাভের পর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম আমার মনে নেই। তবে এই কাণ্ড থেকেই খাতার পাতা ভেদ করে আমার প্রথম গল্পের পল্লব গজিয়েছিল। এবং সেই গল্প এতদিন ধরে অনাদরে পড়েছিল আমার কাছে।

পড়েছিল বলেই আজ আপনাদের আমার প্রথম লেখা এবং কি করে তা লেখা—জানাবার এই সুযোগ আমার হোলো। এর জন্য যা কিছু ধন্যবাদ তা কোনো এক, বা অনেক, সম্পাদকের প্রাপ্য, লেখাটা তাঁদের দরবার থেকে অমনোনীত হয়ে উপর্য্যুপরি ফেরৎ না এলে আজ এইরূপ, এহেন অভাবিত ভাবে, ঈথারের সাহায্যে বিস্তার লাভ করার এমন সৌভাগ্য এর হোতো কি না সন্দেহ।

* রেডিয়ো-পঠিত রচনা।



দানবের জন্ম



এই অকালমৃত্যু—এই শোচনীয় আত্মবিলোপের জন্য কাউকে যদি দায়ী করতে হয় তো শরৎচন্দ্রকে। শ্রীকান্তর ছদ্মবেশে বেনামিতে আত্মজীবনীর রেওয়াজ তিনিই প্রথম সুরু করলেন তো! অবশ্যি তিনি ছাড়াও আরো অসংখ্য লোক এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। তাঁরা শ্রুতিধর জনসাধারণ,—জনশ্রুতির জন্ম দিয়ে—চালু করে'—নব নব দানবের যাঁরা সৃষ্টি করে থাকেন—তাঁরাও নগণ্য নন্। অগণ্যই তাঁরা—তাঁরা গণনার মধ্যে পড়েন না।

সান্ত্বনা গুঁই নিজের আপিসে কাজ করতেন। খান্-দান্—ঘুমোন্, সাদাসিদে মানুষ। এরকম শান্তশিষ্ট লোক আমার চৌহদ্দির মধ্যে আমি দেখিনি। আনাড়ি এবং অপাপবিদ্ধ—যদ্দূর হতে হয়। বিয়ে করেছিলেন এবং বৌকে খুব খাতির করতেন। বেলুড় মঠেও গতায়াত ছিল। খেলার মাঠেও দেখতাম। অর্থাৎ, সবদিক থেকেই সর্ব্বদোষশূন্য এমন সুচারু লোক প্রায়শঃ দেখা যায় না। এবং এছাড়াও—

অধিক গুণ-বর্ণনায় কথা বাড়ে; এক কথায়, সান্ত্বনা গুঁই ভূভারতে বিরল। এবং এখন তো বিরলতম ঃ আর কেন যে তাঁর এই আকস্মিক বিরলতা সেই মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা বলার জন্যেই এই কাহিনী।

সান্ত্বনা গুঁইর অগুণতি গুণের মধ্যে একমাত্র দোষ—তিনি একটু কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। উক্ত প্রবণতার সাহায্যে মাঝে মাঝে যখন তিনি গল্প লেখায় মত্ত হতেন, তখন তার দোষাবহতা তাঁর নিজগুণফলে বেড়ে গিয়ে বেশ ভয়াবহ হয়ে পড়ত। তবুও, ও-বস্তু যে মাসিকের সম্পাদক বা তাঁর আশপাশের শ্রোতাদের ভয় দেখানো ছাড়া কোনোদিন ওঁর নিজের ভয়ের কারণ হয়ে উঠবে তা কেউ কখনো ধারণা করতে পারেনি।

কিন্তু সেই ভয়ঙ্করই একদিন ঘট্‌ল। গু°ইমশাই এক কাণ্ড করে' বস্‌লেন। গল্প মক্‌সো করতে করতে, হঠাৎ কী খেয়ালে এক উপন্যাস ফেঁদে ফেললেন। যা তা উপন্যাস নয়, আস্ত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। খুনখারাপি, দারোগা পুলিশ, রোমাঞ্চকর সব ব্যাপার। কিছুদিন ধরে' বটতলার রক্তারক্তি সিরিজের—বইগুলো তো বেজায় চালু—তিনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন—সেই গ্রন্থমালার যতো রক্ত জমাট্‌ বেঁধে গরম হয়ে তাঁর মাথায় উঠে এই দুর্ঘটনার হেতু হোলো কিনা বলা যায় না। যাই হোক, সান্ত্বনা গু°ই বইখানা বেশ পুরু কাগজে পরিষ্কার ছবি-ছাপায় ভালো করে বাঁধিয়ে বাজারে ছাড়্‌লেন এবং বার করবার পরই, দুঃখের বিষয়, তিনি মারা পড়্‌লেন। বইখানাই তাঁকে মারল।

তবু বল্‌তে কি, বইখানা এমন কিছু মারাত্মক ছিল না। খুব সাধারণ একখানা খুন; চল্‌তিও বলা যায়, অচলও বলা চলে। বইয়ের নায়ক—বলাবাহুল্য এক খুনে—তার একটি হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে-টাইপিষ্টকে ছাতাপেটা করে' শেষ করেছে। তার পরে উক্ত মেয়েটির মৃতদেহ বস্তাবন্দী করে কাঁধে করে' গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছে (স্বর্গীয়ার সদ্‌গতির জন্যেই খুব সম্ভব)। এমন কিছু অসাধারণ নয়—তবু বইটার মধ্যে এমন কিছু ছিল—যা আপামর সাধারণকে আকর্ষণ না করে' পারল না। প্রায় সব কাগজেই বইখানার ভালো সমালোচনা বেরুল। একজন সমালোচক বল্লেন, "এ রকম পরিপাটি বই বহুদিন পড়িনি। যা আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দেখা দিচ্ছে অথচ আমাদের চোখে পড়ে না সেই সব খুঁটিনাটি জিনিষ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অনেক লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন এর

আগে ; কিন্তু ইনি সে-জাতীয় নন্। যে সব কাণ্ড আমাদের আশেপাশে একদম্ দেখতে পাই না—অথচ দেখতে পাওয়া উচিত এবং যার জন্য একখানা ছাতাই যথেষ্ট—সেই সব অবশ্যঘটনীয় দৃশ্যের দিকেই লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনিও আমাদের কম ধন্যবাদের পাত্র নন্—এই জন্যই।"

এক দৈনিকের সম্পাদক লিখলেন, "যদি কামান, বন্দুক না হলেও চলে, কেবল ছাতাতেই হয়ে যায়, তা হলে আমাদের ভারতবর্ষ এখনো পরাধীন কেন ?···(কিন্তু বোধহয় এই লাইনটা লেখার পরই তাঁর মনে হয়েছে এখনকার পরিস্থিতিতে ওটা লেখা উচিত হয়নি—হয়ত বা তত নিরাপদ নয়—কিন্তু আবার তুলে ফেলাও গুরুতর—লাইন্ তোলাও যায় না—বিপজ্জনক এবং আইনতঃই নিষিদ্ধ—কাজেই গোলমালে পড়ে' ওর পাশাপাশি আর একটি লাইন বসিয়ে সব দিক বুঝি বজায় রেখেচেন। তারপরেই তার পরের লাইন) "পাকিস্থানই বা সুদূরপরাহত কিসে ?" (এবং কেবল এই বিষয়েরই পাকাপাকি নয়, পুনশ্চ আরো,) "আমাদের চাররারেই বা এত পাওনাদার কিসের জন্য ?" এই বলে', একেবারে চূড়ান্ত করতে তিনি ক্ষান্ত হন্‌নি, আমাদের সান্ত্বনার চেয়ে কম দেননি কিছু।

আরেকজনের সমালোচনার সারাংশ : "নিঃসন্দেহ এ-বইটি মূল্যবান এবং মহিলার রচনা বলেই আরো বেশী মূল্য এর। কেননা কোনো লেখিকা ছাড়া এরকম নিখুঁত আর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অন্য কে দিতে পারে ? এ কেবল গ্রন্থকর্ত্রীদের কলমেই সম্ভব। অনেকদিন এই ধরণের উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী আমরা পড়িনি। যদিও সান্ত্বনা দেবীর ভ্রমণকাহিনীর বেশীর ভাগই ভ্রমাত্মক—জলধর সেনের হিমালয় থেকে

কারচুপি-করা বলেই আমাদের বোধ হোলো তবুও এই জাতীয় রচনায় তাঁর যে বিশিষ্ট স্থান আছে একথা মুক্তকণ্ঠেই বলা যায়।”

ভ্রমণকাহিনী? এ সংবাদ তো সান্ত্বনার জানা ছিল না, তাঁর তাক্ লাগে। নিজের বইয়ের বিষয়ে নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হয়ে, দারুণ বিস্ময়ে তিনি আরেক বার তাঁর বইয়ের পাতাগুলো উল্‌টে যান। ওঃ, হয়েছে! সেই যেখানে নায়ক, নায়িকাকে খতম্ করবার পর, অন্তর্দ্ধানের তাগাদায় হিমালয়ের অন্তঃপুরে কোনো গোপন গুহায় পালিয়ে যাবার প্ল্যান্ আঁটছে—সেই যেখানে, মেঘমেখলা তুষারকিরীট চাকচিক্যময় পর্ব্বতমালা ক্রমোচ্চ পরম্পরায় মনশ্চক্ষে দর্শন করে' চমৎকৃত হচ্ছে—যেখানটায় সে বাজারের মন্দাক্রান্তা ছন্দকে থোড়াই কেয়ার করে' পাওনাদারদের তর্জ্জন আর পুলিশের তর্জ্জনীকে কলা দেখিয়ে, অফিসশূন্য, টাইপিষ্টলেশহীন গিরিদরী-উপত্যকার নির্ঝঞ্ঝাট্ নিবিড়তার নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ক্রোড়ে নিজেকে রপ্তানি করবার মৎলবে গদ্‌গদ—সমালোচক মশাই খুব সম্ভব সেই পৃষ্ঠাটি—কেবলমাত্র সেই একটি পাতা পড়েই, ডিটেকটিভ্ উপন্যাসকে ভ্রমণ কাহিনী বলে' ভ্রম করেছেন। ওস্তাদের মার্ তো। তার জন্য এক পৃষ্ঠাই যথেষ্ট! একটা পৃষ্ঠ পেলেই হোলো!

সমালোচকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে' সান্ত্বনা শুঁই কতটা প্রবোধ পান্ তিনিই জানেন, তবে তাঁকে লেখিকা জ্ঞান করে' পাঠকরা যে অনেকখানি সান্ত্বনা পেয়েছেন সেটা বইয়ের চলৎশক্তি থেকেই বোঝা গেল। পোকারা বাধা না দিলে, দোকানদাররা বিপক্ষে না গেলে এবং ক্রেতারা হাতছাড়া করতে নারাজ না হলে বইরা সাধারণতঃ অপরের হাতে হাতেই চলে—এবং এই ভাবেই প্রত্যক্ষ

বই অপরোক্ষ হয়ে ওঠে। বিস্ময়ের বিষয়, এই বইটির বেলাও তার অন্যথা হোলো না। প্রত্যেকের হাতে হাতে নগদ্ প্রমাণ পাওয়া গেল।

বইয়ের কাট্‌তি থেকে এবং সমস্ত জড়িয়ে মোটের ওপর সান্ত্বনা গুঁইর মন্দ লাগ্‌ছিল না—

মন্দ লাগতও না, যদি না তাঁর আত্মীয়জন আর বন্ধুবান্ধব বইটির অন্যবিধ ব্যাখ্যা করতেন—

পড়বামাত্রই বইটাকে তাঁরা সান্ত্বনা গুঁইর আত্মজীবনী বলে' ধরতে পেরেছিলেন এবং কেবল উপলব্ধির আত্মপ্রসাদেই ক্ষান্তি না হয়ে উক্ত আবিষ্কার-কাহিনী দিগ্বিদিকে রটনা না করে' তাঁদের শান্তি হোলো না। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—!' কিন্তু তাঁদের এই বহুমুখী উপভোগের প্রতিভাই সান্ত্বনা গুঁইকে আরো ত্যক্ত করে তুলল। ফিস্‌ফাস্ থেকে গুজগুজ—গুঞ্জনধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চতর হয়ে মুক্তকণ্ঠ হয়ে উঠল—পৃথিবীর কারো আর জানতে বাকী রইল না। এদিকে, ভগবানের প্রতি ছাড়া আর সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস অকপট, অকপট আর ছোঁয়াচে,—অতএব এই সংক্রামক আর মারাত্মক বিশ্বাসের খর্পরে পড়ে জনসাধারণও অচিরে সায় দিয়ে ঘাড় নাড়তে সুরু করে দিল।

দেখুন না কেন, বইয়ের ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা এবং সান্ত্বনা গুঁইও কলকাতায় থাকেন; বইটিতে যে মেয়েটি খুন হয়েছে সে একজন টাইপিস্‌ট্, আর সান্ত্বনার আপিসেও জনৈকা মেয়ে টাইপিস্‌ট্ কাজ করত। তাছাড়া, সব চেয়ে ভয়াবহ মিল, বইয়ের নিহত মেয়েটি যারপরনাই হৃষ্টপুষ্টারূপে বর্ণিতা। আর এধারে সান্ত্বনার আপিসের

টাইপিস্‌ট্‌টিকে চাক্ষুস করার যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল তারা হলপ্‌ করে যে ছুটি মেয়েই হুবহু অবিকল। কারো কারো মতে অবশ্যি, টাইপিস্‌ট্‌টিকে বইয়ের নায়িকার সঙ্গে তুলনা করলে বরং অবিচার করা হয়—টাইপকর্ত্রীকে যথেষ্ট হালকা এবং খাটো করা হয়—কেননা কেবলমাত্র ভারিক্কী বললে কিছুই তার বলা হোলো না, তিনি শুধু স্থূল নন—স্থূলস্থূল।

এরূপ অনেক অনুরূপ মিল পাওয়া গেল—অণু পরিমাণের বড়ো বড়ো আরো অনেক মিল। সবার উপরে টেক্কা দিলো ডালকুত্তার ঐক্য। বইয়ের নায়কের একটা ডালকুত্তা ছিল, এবং কী আশ্চর্য্য, লেখকেরও একটা পোষা কুকুর রয়েছে। সাম্বনার কুকুরটি যদিও কোনো বিশেষ ডালের নয়, এদেশী একটা দোআঁশালই বলতে গেলে,—তাহলেও মিলনের উত্তেজনার মুখে এই সব ইতরবিশেষে কেউ কি নজর দেয়?

এইভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সমস্ত ব্যাপারটাই নিখুঁতরূপে স্পষ্ট হয়ে গেল; যদ্দুর প্রাঞ্জল হতে হয়,—এতটা পরিষ্কার আর হয় না। এমন কি, সহরের বন্ধুরা দেখা হলেই জিজ্ঞেস শুরু করলেন: "তোমার সেই ডালকুত্তাটা কেমন আছে ভায়া? ভালো তো?" কিম্বা, "তোমার সেই পুলিশের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়াটা আমার খুব চমৎকার লেগেছে। দারোগাটাকে যা ঘোড়দৌড় করালে! বাপ্‌স্‌! কোন্‌ জায়গায় লেলিয়ে দিয়েছিলে বলো তো?" বইয়ের কোন্‌ জায়গায়, সেটা যে এখানে জিজ্ঞাস্য নয়, স্পষ্টই বোঝা যায়। ছুএকজন অন্তরঙ্গ, অকৃত্রিম আর ভুক্তভোগী গোছের, আড়ালে ডেকে ফিস্‌ফিস্‌ করেছেন: "ভেবেছিলাম নিজের বৌটাকেই নিকেশ

করবে। আসল কাজই পারো নি, ভারী দুঃখের বিষয়! পরস্ত্রীর গায়ে কেউ হাত দেয়? অন্ততঃ, ঐভাবে হস্তক্ষেপ করে?" অথবা, অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন কেউ: "ঝিকে মেরে বৌকে শেখাচ্ছো নাতো হে? তোমরা খুব সুখী দম্পতি বলেই আমাদের ধারণা ছিল। হায়, রাজায় রাণীতে ঝগড়ায়, মাঝখান থেকে, বেচারা উলুখড়ের প্রাণটা গেল!" কেউ বা: "আপদটাকে সরিয়ে ভালোই করেছ! অনেকখানি ভূভারহরণ করেছ বলতে হবে। ওর জন্যে তোমার আপিসে গিয়ে দেখা করার রুচিই চলে গেছল আমাদের। ওদিকে পা বাড়াতে উৎসাহই হোতো না। যাক্, ভালোই হয়েছে, এইবার একটা সুশ্রী দেখে আর পলকা দেখে লেডি টাইপিস্‌ট্‌ রাখো। কেমন?"

গুঁই-গৃহিণীর আত্মীয়পক্ষ বলতে লাগলেন: "মেয়েটা শেষটায় একটা অপদার্থ খুনের হাতে পড়ল।" অনাত্মীয় পক্ষ, পাত্রের তরফদারদের মুখে শোনা গেল: "কী যে এক অলক্ষুণে মেয়ে ঘরে এলো! ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে এমন করে' সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে গা!" কী শোচনীয়তার মধ্যেই না এই গুঁই-দম্পতির প্রতি মুহূর্ত্ত কাটছে তারই দুর্ভাবনায় অনেকের দিনরাত কণ্টকিত হতে থাকলো।

চূড়ান্ত হোলো গুঁই-গিন্নী স্বয়ং যখন বল্লেন, "তুমি ওসব খারাপ মেয়ের সঙ্গে আর মিশো না। তোমার টাইপের চিঠি আমাকে দিয়ো, আমি টাইপ্ করে' দেব। টাইপরাইটার দিয়ো, ও আর শক্ত কি, ধীরে সুস্থে করে দেবখন। আস্তে আস্তে আমি বেশ ভালো টাইপ করতে পারি। কদিনে একখানা চিঠি টাইপ করে দিলে তোমার চলে বলো তো?"

এমন কি, চূড়ার ওপরে ময়ূরের পাখাও দেখা দিল। অবশেষে একদিন কবিগুরুর প্রশস্তি-বাণীও এসে পৌঁছল (বস্তুতঃ, তা জাল কিম্বা ভেজাল কিনা, তাঁর তিরোধানের পরে আজ আর জানার উপায় নেই)। তাঁর প্রশস্ত প্রশংসাপত্র খুব সংক্ষেপেই তিনি সেরেছেন : (বিশ্বভারতীর বিনানুমতিক্রমেই এখানে তা প্রকাশিত হোলো)

কল্যাণীয়েষু, তোমার বইটি আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। কলমের জোরের পরিচয় না পেলেও তোমার ছাতার জোরের প্রমাণ পেলাম। বাহুবলের যথেষ্ট নিদর্শন তুমি দিয়েছ এবং কেবল হাতের ছাতিই নয়, তোমার বুকের ছাতিও আছে—তারও আমি বাহাদুরি দিই। এই অসাধ্যসাধন, সাহিত্যক্ষেত্রেই অবশ্য, আমার সাহসে কখনো কুলাতো না। বাংলা ভাষার যে রোমহর্ষক বিভাগে, পত্রে পত্রে আর ছত্রে ছত্রে রোমাঞ্চ নিয়ে তুমি প্রবেশলাভ করলে সেখানে তোমার একছত্র আধিপত্য কায়েমী হোক, এই শুধু আমি কামনা করি। ইতি

শুভার্থী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চঃ, মেয়েটিকে হত্যা না করলে কি চলতই না ?

বাস্তবিক, কেন যে মেয়েটাকে খুন করা হোলো সেই এক সমস্যা। অকারণ পুলক, কিম্বা মুহূর্ত্তের হস্তস্খলন—কি জন্য যে তাঁর নায়কের ওরকম ছত্রচ্যুতি ঘটল সারা বইয়ে তার কোনো সুরাহা নেই। টাইপিস্‌টের নতুন টাইপের দেহসুষমাই ঐ জিঘাংসা জাগানোর মূলে কিনা তাও বলা কঠিন। নায়ক কিম্বা লেখক—ছাতার সম্বল দুজনেরই আছে বটে, কিন্তু উভয়ের কাউকেই পরশ্রীকাতর

বলে তো মনে হয় না। অন্ততঃ সাত্বনার নিজের তো নিজেকে তা মনে হয় না।

রহস্যই বটে! সমস্তটাই একটা দুর্ভেদ্য রহস্য বলে বোধ হয়—কেবল পাঠকেরই না, লেখকের কাছেও। এমন কি, তাঁর টাইপিসট মিস্ কারফর্ম্মাকে সত্যি সত্যি তিনি কোতল করেছেন কিনা (তাঁর নিজের টাইপিস্‌টকেও!) এমন সংশয়ও তাঁর সময়ে সময়ে হয়; সেই সন্দেহ দিনকে দিন ঘোরালো আর জোরালো হতে থাকে। তা না হলে, মেয়েটি সেই যে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে সে কি নিরুদ্দেশেই গেল? এখনও তার ফেরৎ না আসার হেতু কী? এতদিনে তার তো টাইপরাইটারের সম্মুখে এসে আবার ঘন হয়ে জমার কথা! তাহলে—তাহলে—তবে কি—তাইই কি তার এই ঘোরতর অদর্শনের কারণ? তাঁর স্বহস্তে ছত্রাহত হয়ে বেচারী পরলোকের পথে রওনা দিয়েছে বলেই আর ফিরতে পারছে না? তাহলে তিনিই তাকে, খুব সম্ভব নিজের অগোচরে, কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে সাবাড় করেছেন? যাহা রটে তাহা বটে তাহলে?

ভাবতেই তাঁর শিহরণ হয়! মিস্ কারফর্ম্মাদর্শনের নিত্যকর্ম্ম থেকে তিনি চিরবঞ্চিত হয়েছেন—তার রূপসুধাপানের দায় আর তাঁর নেই—সেই অব্যাহত বিভীষিকার হাত থেকে অব্যাহতির আনন্দ কম না! কিন্তু তবু একটা খটকা কোথায় যেন খচ খচ করে,—সত্যিই কি তিনি শেষ করতে পেরেচেন? শেষ পর্য্যন্ত?

সেটা কি সম্ভব? সামান্য একটা ছাতার মারফতে—? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্যি, বাঙালীর হাতে ছাতা একটা ভয়ানক

জিনিস সে কথা খাঁটি—মাথায় করে রাখতে না পারলে সে যে তাকে কোথায় রাখবে তার থই পায় না। ছাতাকে ঠিক মত বাধ্য রাখা তাদের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার—হায়রে, এ জাতের হাতে হাতিয়ার বন্দুক থাকলে আরো কী বীরত্বব্যঞ্জক আর শোচনীয়তর কাণ্ডই না ঘটতো! ছাতাকে সামলাতেই এদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা—যে-ব্যক্তি ছত্র ধারণ করে' থাকে তার হয়ত সেটা ধারণার মধ্যে না এলেও তার এবং ছাতার চার ধারের আর সবাইকে সভয় ও সতর্ক হয়ে থাকতেই হয়! অপরের হস্তগত হলে ওর থেকে সাত হাত দূরে থাকাই শ্রেয়—কখন্ যে ও-বস্তু মুক্ত হয়ে ব্রহ্মতালু বিদ্ধ করতে থাকবে আর কখন্ বা বোজা অবস্থায় সোজা চোখের মধ্যে এসে সেঁধুবে কিছুই স্থিরতা নেই। গায়ে পড়ে খোঁচা লাগানো তার পক্ষে কিছুই না, নিতান্তই স্বাভাবিক কাজ, এমনকি, পরের পকেটের মধ্যে মাথা গলিয়ে (যার পকেট তার অজান্তেই,) পকেটওয়ালাকে সমেত সব শুদ্ধ টান মারতেও ওর বাধা নেই। তবু, আর্ম্মস্ অ্যাক্টের অন্তর্গত হবার যত বড়ই ওর দাবী থাক্ তার সাহায্যে মিস্ কারফর্ম্মার মতো জবরদস্ত কোনো মেয়েকে দাবানো যায় একথা একদম্ ভাবাই যায় না। নিজের ছত্রপতিত্বে সান্ত্বনার আস্থা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসতে থাকে।

উঁহু! বোধহয় উনি কৃতকার্য্য হতে পারেন নি, ওঁর ঘোরতর সন্দেহ জাগে।

আশঙ্কাটা আরো বদ্ধমূল হোলো যখন বাবলু এসে বল্লে: "বাবা, ছাতা দিয়ে অমন একটা মোটা মানুষকে কি করে' তুমি—তোমার ছাতা ভেঙে যায়নি বাবা?"

তখন তাঁর মনে হোলো বইয়ে তিনি সাফল্য লাভ করলেও,

করতে পারলেও, আসলে বোধহয় তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। মিস্ কারফর্ম্মার পক্ষে ওরকম দশ বিশটা ছাতা উড়িয়ে দেওয়া একটা



ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন।

ফুঁয়ের ব্যাপার। একটা ফুৎকারের অপেক্ষা মাত্র। ছাতা তো ওঁর কাছে ব্যাঙের ছাতা! সেই তেজের সামনে পুরণো তৈজসের ছাতার মতো মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যাবার।

"তার চেয়ে বাবা, মেয়েটাকে তুমি তেতলার ছাতে নিয়ে গেলে না কেন? ভুলিয়ে ভালিয়ে একেবারে ধারে নিয়ে গিয়ে এক ধাক্কা?"

হ্যাঁ, সেও একটা পথ ছিল বটে—ছাতির বদলে ছাতের দ্বারাও

সারা যেত না যে তা নয়! তাহলে, সেই মেয়েটিই তখন ছত্রাকারে গিয়ে মাটিতে পড়তো! পত্রপাঠ জবাব! মন্দ হোতো না খুব।

"মেয়েটাকে তুমি মারলে কেন বাবা? লুকিয়ে লুকিয়ে টাইপ করছিল বুঝি!...আমি কিন্তু তোমার টাইপরাইটারে আর হাত দিই না বাবা।"

নিস্পৃহার বিজ্ঞাপন দিয়ে বাবাকে বা নিজেকে—কাকে সে আশ্বস্ত করতে চায় সেই জানে, কিন্তু বইটা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার (ঘরের এবং বাহিরের) কী গভীর মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে তার দৃষ্টান্ত পেয়ে সান্ত্বনার গভীরতর বৈরাগ্য জাগে। তাঁর মনে হয়, তাঁর বইয়ের হতভাগ্যের মত তিনিও হিমালয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন! এই ভুল বোঝার সংসার থেকে অন্তর্হিত হবার জন্য তাঁর অন্তর লালায়িত হতে থাকে।

এদিকে সন্দেহের কুয়াসা ক্রমেই আরও গাঢ় হয়, ঘন হয়ে থরে থরে জমে ওঠে, সমাজের প্রত্যেক জীবস্তরে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ! ঝি-চাকররা কেউ বাড়ীর ছায়া মাড়াতে চায় না, কাজে লাগা দূরে থাক্! পাড়ার ছেলেপিলেরাও ভয়ে ধার ঘেঁষে না, যদি বা কখনো ঘেঁষে, পা টিপে টিপে বৈঠকখানায় ঢুকেই, পড়বি তো পড়, ওই বইয়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রুদ্ধশ্বাসে বইটা শেষ করে' রোমাঞ্চিত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়। আশ-পাশের বউ-ঝিরা কেউ অন্দর পথে এলে এবং দৈবাৎ ঐ বইয়ের ওপরে বারেক চোখ বুলোতে পেলে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে সদর পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ডাইং ক্লিনিং-এ কাচনোর জন্য কাপড়চোপড় নিয়ে গেলে (ভৃত্যাভাবে সান্ত্বনাকেই ভৃত্যভাবে যেতে হয় আজকাল) সেখানকার



কর্ম্মচারীরা সেগুলো ভালো করে' উল্‌টে পাল্‌টে ছাখেন এবং দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞেস করেন: "রক্তের দাগটাগ নেই তো মশাই?" দাগ না দেখেই তাঁদের রাগ হয় কি না কে জানে। ডাকযোগে কোনো পার্শেল পাঠাতে গেলে সারা পোষ্টাপিসে ডাকাডাকি পড়ে যায়, খোদ্ পোষ্টমাষ্টার এসে পড়েন, তাঁর সামনে পার্শেল খুলে দেখাতে হয়, ভেতরে কাটা মুণ্ডুটুণ্ডু আছে কিনা স্বচক্ষে না দেখে তিনি ছাড়েন না।

অন্যে পরে কা কথা, জন্তুরা পর্য্যন্ত অমানুষিক ব্যবহার সুরু করে দিল। জানোয়াররা অপরের অপরাধ সম্বন্ধে অতি সজাগ—কি করে' যেন জানতে পারে। সান্ত্বনা লক্ষ্য করল, কুকুর ওকে দেখতে পেলে ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে নেয়, প্যাঁচারা চ্যাঁচায় কিম্বা অন্য চোখটাও বুজে



ফ্যালে, আসে'লারা ফর্-ফর্ করতে থাকে, কেন্নোই গোল পাকায়, এমন কি, ঘোড়ারা পর্য্যন্ত গাধার মতন একটানা তারস্বর ছাড়ে।

বেড়ালরা ওকে টের পেলেই দৌড় লাগায়, ইঁদুররাও দাঁড়ায় না, আর হাতীরা?—হাতীরা কি করে জানা যায় নি, কেননা অদ্যাবধি সান্ত্বনার সম্মুখে তারা এগোয় নি। তবে ছারপোকা-মশারাও পারৎপক্ষে সান্ত্বনার গায়ে বসে না, এটা দেখা গেছে।

অঘটনের ওপর অঘটন! আপামর সকলের কাছে তার অপরাধ যখন সাব্যস্ত, এমন কি, এসম্বন্ধে তার নিজের দ্বিধাও প্রায় তিরোহিত, এমন সময়ে একদিন সান্ত্বনা সন্ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে তার নিজের আপিসে ঢুকতেই দেখতে পেল,—কাকে দেখতে পেল? তার টাইপিস্ট্ মিস্ কারফর্ম্মাকে! নিহত বলে' তথাকথিত সেই মহিয়সী মহিলা টাইপরাইটারের সামনের চেয়ারে জমাট হয়ে এক মনে একটা বই পড়ছেন! তারই বই! তারই শেলফের থেকে, সেল্ফ্-হেল্পের সাহায্যে বার করেছেন বুঝতে দেরি হয় না।

সান্ত্বনা, খুব সম্ভব আহ্লাদেই, প্রায় লাফিয়ে ওঠে এবং তার হাতের ছাতাটিও সেই হর্ষোচ্ছাসে সায় দ্যায়। 'ইউরেকা!'—তার কণ্ঠ থেকে কলধ্বনি হয়ে বেরিয়ে আসে। ('Eureka!' কিম্বা 'You Wrecker!'—কী সে বলে ঠিক বোঝা যায় না—রাগ-অনুরাগের প্রাবল্যে বৈদেশিক বা বৈপ্রাদেশিক ভাষায় স্বভাবতঃই আমাদের খই ফুটলেও—যে কোনো ভাষারই কলকলনাদ ওতোপ্রোত হলে অবোধ্য হতে বাধ্য)।

মিস্ কারফর্ম্মার দৃষ্টি বই থেকে সরে' সান্ত্বনার ওপরে গিয়ে পড়ে। ছাতার আন্দোলনও তিনি দেখতে পান্। তার পরে আর দেখতে হয় না—সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বই আর চেয়ার ফেলে এবং সান্ত্বনাকে ঠেলে 'খুন!—খুনে! খুন্ করলে!'—এই বাক্যথাই ছাড়তে ছাড়তে তর্ তর্

করে' সিঁড়ি দিয়ে সরে পড়েন। বিপুল দেহের পক্ষে দর্শনীয় তৎপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, উক্ত উল্লেখযোগ্য উদাহরণ-স্থাপনের পর সেই যে তিনি অদৃশ্য হন্, আর তাঁকে দেখা যায় না। তারপরে আর কোনোদিন দেখাও যায় নি।

এই দুর্ঘটনার কয়েক দিন পরে সান্ত্বনা একাকী তাঁর নির্জ্জন আপিসে বসে আছেন,—আপিসের কর্ম্মচারিরা, এমনকি, বেয়ারাটি পর্য্যন্ত, অধিক কি, চার পাশের কামর‍্যায় অফিসওয়ালারা অবধি সেখান থেকে বহু পূর্ব্বেই সট্‌কান্ দিয়েছিল—কাজেই, একলা বসে' বসে' প্রতিভাধর ঔপনাসিকের মত নিজের জীবনের নানান্ কার্য্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন, এমনও হতে পারে এবার সত্যিই একখানা আত্মজীবনী লেখবার ফন্দী আঁট্‌ছেন এমন সময়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে দুটি অচেনা আগন্তুক তাঁর কক্ষে এসে দেখা দিল।

"আমরা লালবাজার থেকে আস্‌ছি।" বল্ল তাদের একজন: "ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট।"

"ও!" সান্ত্বনা চম্‌কে উঠে একটু নড়ে চড়ে বস্‌ল।

"আমরা আপনার লেডি টাইপিস্‌টের খোঁজ নিতে এসেছি।" বল্ল অপরজন।

"ওঃ!" সান্ত্বনার মুখে সেই একই অব্যয় শব্দ। একটু বিসর্গযুক্ত হয়েই এবার।

"লাশটা কোথায়?"

"লাশ! লাশই বটে!" সান্ত্বনা হঠাৎ অট্টহাস্য করে' উঠল: "যথার্থ বলেছেন, লাশই বটে একখানা!"

কর্ম্মযোগীর কর্ম্মভোগ



যোগানদারি কাজে বিয়োগ আছেই। এক ঘর থেকে বিযুক্ত করে' অন্য ঘরে নিযুক্ত করতে পারাটাই এর গুণ। যোগানো মানেই বিয়োগানো ; যতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে যে পারে ততই তার বাহাদুরি। লাভের কড়ি ভাগ করতে জানাই এর গুণগরিমা। এই ভাবে বহুগুণ হয়ে ভাগফল যেটা থাকে সেটাই ভাগ্যফল।

এবং শেষপর্য্যন্ত তা 'মা ফলেষু' হয়ে দাঁড়ালেও যে বিচলিত হয় না, অনুরূপ আরেক মরীচিকার পেছনে দৌড়তে প্রস্তুত হয় সেই হচ্ছে খাঁটি যোগানদার। গীতায় তাকেই কর্ম্মযোগী বলেছে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—ত্যাগের দ্বারাই যার ভোগ, কর্ম্মভোগই বলা উচিত, কিন্তু ত্যক্ত হওয়া যার ধর্ম্ম নয়—উপনিষদ-জোড়া সেই মহাপুরুষেরই তো মাহাত্ম্য!

নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে এই সব তত্ত্বকথা ভাবছিলাম। 'করম্‌চাঁদ'! 'করম্‌চাঁদ'! 'করম্‌চাঁদ নিয়োগী!'—ভারী ডাকাডাকি পড়ে গেছল চার দিকে। 'করম্‌চাঁদ নিয়োগীকে ডাক্‌ছেন বড় বাবু!' এই খবর জানিয়ে ছোটবাবু আমার পাশ দিয়ে চলে গেছেন একটু আগেই।

কিন্তু আমি কান দিইনি। সত্যি বল্‌তে, ঠিক কী নামে যে এখানের কাজে আমি যোগ দিয়েছি আমার নিজেরই মনে ছিল না। 'সাম্‌হোয়্যার্‌ ইন্‌ আসাম্‌' যোগানদারের আড়ত। মিলিটারি ঠিকাদারির কাজ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাউনি, ছোট সাহেব, বড় সাহেব ; ছোট বাবু, বড় বাবু ; কেরাণী, কুলীমজুর ; মাল এবং বামালে ছয়লাপ! তার মধ্যে আমিও একজন কাজের লোক।

"এই করম্‌চাঁদ। ছোটবাবু যে গোরু-খোঁজা করছেন তোমায়।" একজন সহকর্ম্মী এসে আমাকে জানালো।

"তাই নাকি?" চমকে উঠতে হয়—"শুনতে পাইনি তো।"

"যাও, শোনোগে তাঁর তাঁবুতে, কেন ডাক্‌ছেন। এই ডাকাডাকির ছুতোয় আমাদের কাজের মধ্যে এসে আবার তিনি ঘোরাফেরা করেন এটা আমরা চাইনে।" সহকর্ম্মীর একটু উত্যক্ত ভাব।

"কর্ম্মবীর আমার নাম। কর্ম্মবীর নিয়োগী। করম্‌চাঁদ তো নয়, তাই চুপ করে' আছি। আমায় যে ডাকা হচ্ছে তা আমি জানব কি করে'?" অনুযোগের সুরে আমি বলি।

"গেলেই টের পাবে। তুমি ছাড়া আর কোনো কর্ম্ম আমাদের এখানে নেই।" সহকর্ম্মী জানায়। "আমরা সবাই অকর্ম্মা।"

আস্তে আস্তে পিরাণটা গায়ে দিয়ে খাড়া হলাম। ছোটবাবু চেঁচাচ্ছিলেন তখনো।

"আমাকে ডাকছেন ছোটবাবু?"

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আধ ঘণ্টা ধরে' আমি চেঁচিয়ে মরছি।" ছোটবাবুব গলা মোটেই খাটো নয়। "যাও, বড় বাবুর তাঁবুতে যাও। তিনি তোমায় খুঁজছেন, কেন জানিনে।"

বড়বাবু নিজেই এগিয়ে এসেছেন দেখা গেল।—"ও, তোমারই নাম করম্‌চাঁদ? তুমিই বুঝি নতুন ভর্ত্তি হয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।"

কথায় কথায় তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিলেন। "এর আগে তুমি কী কাজ করতে করমচাঁদ?" জিজ্ঞেস করলেন আমায়।

"নাইটের কাজ করতাম।" আমি জানাই।

"নাইটের কাজ ? ও, তাহলে তো দিনের কাজ করতে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে—"

"আজ্ঞে, সে-নাইট্ নয়। একজন নাইটের কাছে কাজ করতাম। একজন সারের সেক্রেটারী ছিলাম। এস্-আই-আর্ সার্—ষাঁড় নয়।" প্রকাশ করে' বল্‌তে হোলো।

"ও, সেই নাইট্! ভালো ভালো। তাহলে তুমি পারবে। আমাদের বড় সাহেবের একজন প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর দরকার। কার কাছে কাজ করেছিলে বল্লে ?"

"জব্বলপুরের সার্ রামশঙ্কর পাল। তিন বছর ছিলাম তাঁর কাছে।"

"জব্বলপুর ? জব্বলপুরে আমি কখনো যাইনি। পশ্চিমের কাউকে চিনি নে। যাই হোক্। এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে যদি তুমি কাজ করে থাকো তাহলে এহেন কাজ তোমারই যোগ্য। আমাদের বড় সাহেবের এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে দেওয়া—এই কেবল কাজ। তা, তুমি পারবে।"

"নিশ্চয়। এতো আমার লাইনের। সেখানেও ঠিক এই কাজই করতাম। বড়লোকদের প্রাইভেট্ কাজ, এ ছাড়া আর কী হতে পারে, বলুন্ না ?"

"তা বটে। তা বেশ। তাহলে তোমার নামটাই বড় সাহেবের কাছে পেশ করে' দেব। এখন যা বেতন পাচ্ছো তার তিন গুণ পাবে, বুঝেচ ? তোমার রিস্ট্ ওয়াচটি তো ভারী খাসা দেখচি। একবার দেখতে পারি ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" রিস্ট্ ওয়াচটা খুলে দিলাম ওঁর হাতে।—

"এটা খাঁটি সোনার। বাবা আমাকে উইল করে' দিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে আরো অনেক দামী দামী জিনিষ ছিল। বাবা এক নেটিভ্ ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন কিনা।"

"চমৎকার ঘড়ি। দামীও বটে। পেছনে মনোগ্রাম্ খোদাই করা আছে দেখা যাচ্ছে।" বড় বাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা ছাখেন।

"হাঁ, মশাই। এন্ সি এন্—নরমচাঁদ নিয়োগী—আমার বাবার নাম।" বল্‌তে বাধ্য হই।

"এটা তোমার বিক্রি করার ইচ্ছে নেই? না?"

"প্রাণ থাক্‌তে নয়। বাবার জিনিষ, ছেলের কি উচিত কাবার করা—আপনিই বলুন্?" আমি বলি, "তবে আপনার যদি ধূমপানের ধূমধাম থাকে তাহলে আপনাকে আমি একটা রূপোর সিগ্রেট্ কেস্ দিতে পারি। সেটাও বাবার কাছ থেকেই পাওয়া, কিন্তু আমি তো সিগ্রেট্ খাই না, কাজেই সেটা আমার কোনো কাজেই লাগ্‌ছে না। যদি অনুমতি করেন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আপনাকে সেটি উপহারস্বরূপ দিতে পেলে আমি ধন্য হব।"

"বেশ, তাই দিয়ো। তোমার ব্যবহারে বড্ড খুসি হলাম। কিন্তু এই উপহারের কথাটা যেন প্রকাশ না পায়, বুঝেচো?" বল্লেন বড়বাবু।

"আজ্ঞে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করে' করে' আমার হাড় পেকেছে, ও বিষয়ে আমাকে বেশী করে' আপনার বল্‌তে হবে না।"

বড় সাহেবের সেক্রেটারী হয়ে মাস খানেক তো কাটানো গেলো কোনোরকমে। কাজটা বেতরিবৎ নয়, তবু গোড়ায় যেন একটু কেমন কেমন লাগ্‌তো। কখনো ঠিক এধরণের কাজ করিনি তো! বোতল

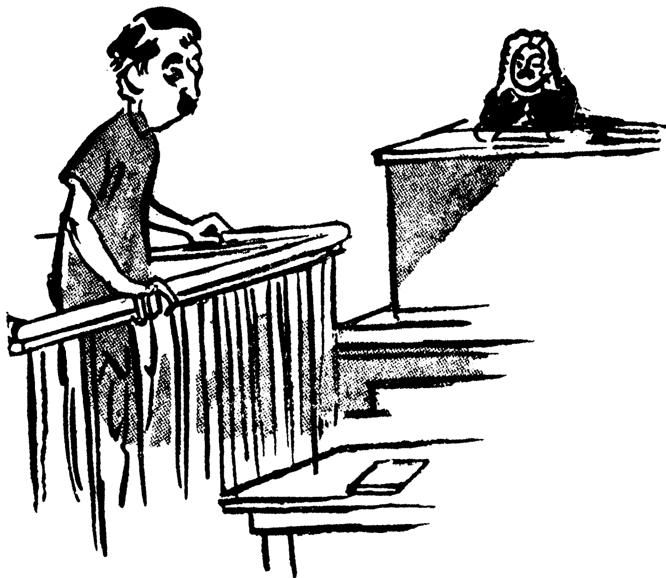
থেকে গেলাসে ঢালাঢালির এই ঢালাও কারবার রপ্ত ছিল না এর আগে। তবে বড় সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে আমার সাধুতা এবং সততার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর হুইস্কির বোতলে নিজের দাগ মারা থাক্‌তো তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু তাঁর বোতল ফাঁক করে খাবার আমার কী দরকার? এখন আমার পয়সার কোনো অভাব ছিল না। কিনেই খেতে পারতাম, ইচ্ছে করলে। এবং সব চেয়ে সুবিধা, আমার এই নতুন কাজটার কোনো ঝক্কি ছিলনা। সাধারণ মজুর কিম্বা কেরাণীর মত—খাটুনিই নেই বল্‌তে গেলে। বেশ, আরামের চাকরি। অবসর মত কাজ করো, আর কাজ হচ্ছে যতো অবসর সময়ের! কাজের মধ্যে কেবল বড় সাহেবের টেবিল গুছিয়ে রাখা আর তাঁর মর্জ্জি মাফিক ঐ যা বলেছি—ঢালাঢালি। ঢালাঢালির দিক্‌টুই আমার—ঢলাঢলি যা করবার তিনিই করতেন।

এমনি তোফা চলছিল, এমন সময়ে—যাকে বলে সেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সেই অঘটনটা ঘটল। এবং বলা দরকার তা' সম্পূর্ণ আমার নিজের দোষে। আমার অসতর্কতার জন্যই। স্বভাবতই আমি সর্ব্বদা সাবধান, কিন্তু গলদ্‌ যখন ঘটবার, কে আট্‌কাবে? আমার সেই হাতঘড়িটা নিয়েই কাণ্ড বাধ্‌লো।

বড় সাহেবের ঢালাঢালির সময়ে মাঝে মাঝে আমি হাতঘড়িটা খুলে রাখতাম—টাঙিয়ে রাখতাম চোখের সীমানায়—সামনের দেয়ালে—এক পলকের জন্যও ওকে আমার নেক নজরের আড়াল হতে দিতুম না। যাকে বলে, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে—!' কিন্তু হলে কী হবে—

সে দিনটায়, কোন্‌ খেয়ালে, ঘড়িটা আমি সেই দেয়ালেই ফেলে রেখে বেরিয়ে এসেছি। ফলে, এখন আমাকে এই আদালতে

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমি নাকি কবে নিফ্‌টার নিকল্‌সন্‌ সাহেবের পাঁচলাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার হীরে জহরতের জিনিষ নিয়ে সরে পড়েছি, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।



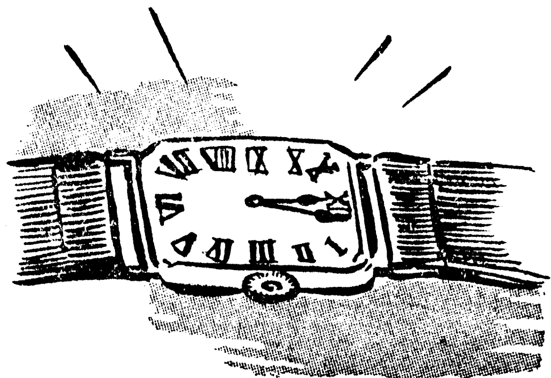
আসামে গেলেই আসামী হতে হয়!

কি করে' যে এমনটা ঘটলো তা আমার কাছে এখন আর অস্পষ্ট নয়। এই নিফ্‌টার ক্রু নিকল্‌সন্‌ লোকটি আমাদের বড় সাহেবের বন্ধু। কার্য্যগতিকে হঠাৎ আসামে আসায়, আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ করতে এসেছিলেন। সাহেবের ঘরে ঢুকে প্রথম দর্শনেই ঘড়িটা তাঁর চোখে পড়ে—এবং তৎক্ষণাৎ নাকি তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না তবে শুনেছি যে তিনি প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ঐ ঘড়িটা নাকি বিলেতের

কোন রাজা না রাণী তাঁকে উপহার দিয়েছিল, তাঁর মূর্চ্ছার ঘোর কাটবার পর এই কথা জানা যায়।

বড় বাবুর জন্য আমার দুঃখ হয়। ভদ্রলোক বড় ভালো, যথাসাধ্য আমার উপকার করার চেষ্টা করেছিলেন,—উপকারের ফল যে এমনটা হবে তিনি তা ভাবতে পারেননি। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁকে আমি সেই সিগ্রেট কেস্‌টি উপহার দিতাম কিনা এখন আমার সন্দেহ হয়। ঘড়ির চেয়েও যে ওটা আরো দামী—ওটা যে আদত প্লাটিনামের—তা আদৌ আমার জানা ছিল না। ওটাও নাকি নিকলসন সাহেবের ঘর থেকে নিকাল-করে-আনা।

এখন এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওরফে-যুক্ত আমার এক গাদা নামের তালিকা স্বকর্ণে আর অম্লানবদনে আমায় শুন্‌তে হচ্ছে। এর আগে কতোবার কতোভাবে আমার জেলখাটা হয়ে গেছে তাও আমি শুনছি। শুনতে বাধ্য হচ্ছি, এবং বড়বাবু ও ছোটবাবুও—সাক্ষী গোপালরূপে তাঁরাও উপস্থিত এখানে—তাঁরাও শুন্‌ছেন। প্রথম দিন তাঁদের নামডাকে সাড়া দিতে কেন যে আমার অতো দেরি হয়েছিল তাও তাঁরা বুঝতেও পারছেন এখন।



কয়লা ভারী ময়লা জিনিস



সেদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দূর থেকে মনে হোলো আমাদের কালীকেষ্টকে কে যেন পথে বসিয়ে গেছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম, না, একেবারে অতটা নয়, নিজের আড়তের দোর গোড়ায় বসে কালীকেষ্ট বল্‌ছে—"কয়লা অতি ময়লা জিনিষ, বুঝ্‌লিরে পাঁঠা ?"

বল্‌ছে একটা পাঁঠাকেই। পাঁঠাটি তার পোষমানা, ভারী আদরের। কবে উদরের হবে এখানে বলা কঠিন। কেবল উপোষমানা কালীকেষ্টই তা বল্‌তে পারে।

পাঁঠার থেকে চোখ হটিয়ে কালীকেষ্টর দিকে তাকালাম। তার মুখখানা কয়লার মতই মলিন।

"পাঁঠার সঙ্গে এই তত্ত্বকথা কেন ? হঠাৎ আবার কী হোলো ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কী আর হবে! কয়লা জিনিযটাই খারাপ। অতিশয় খারাপ।" দীর্ঘশ্বাস ঝাড়্‌ল ও।

কালীকেষ্ট কয়লার ব্যাপারী। এই যুদ্ধের বাজারে সে তিনখানা কোঠা তুলেছে—স্রেফ্‌ কয়লার জোরে। চালের সঙ্গে কাঁকর চালিয়ে, আটার গর্ভে তেঁতুলবিচি আঁটিয়ে কিম্বা চায়ের মধ্যে ওঁচা মিশিয়ে অনেকের বাড়ী তোলার মতো অতোখানি বাড়াবাড়ি কালীকেষ্ট করেনি। কয়লার সঙ্গে কোনরূপ ভ্যাজাল দিয়ে নয়—একেবারে কয়লা না দিয়েই কালীকেষ্টর বাড়ী।

আশপাশের কারখানাগুলোয় ও টন্ টন্ কয়লার যোগান্ দেয়। আর যোগান্ না দিয়েই আমাদের চোখ টন্ টন্ করে। ওর বাড়ীর দিকে তাকালেই যেন কয়লার আঁচ লাগে, গন্‌গনে আঁচ, আর মনটা

আমাদের পুড়তে থাকে। কতো মণ কয়লার বাড়ী কে জানে। কয়লা উড়ে এসে পড়ে চোখ কর্‌কর্‌ করে যেন।

একটু খুসি হয়ে বল্লাম, "ব্যবসা বুঝি ভালো চল্‌ছে না—না কি ?"

"ব্যবসা। ব্যবসার কথা আর বোলো না। আমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।" বল্লে কালীকেষ্ট।

একটু আগে আমারও তদ্রূপ সন্দেহ হয়েছিল।—"তোমাকে পথে বসায় এমন কে আছে দাদা ?" সাগ্রহে জান্‌তে চাইলাম।

"ভাটিয়া কারখানার নতুন ম্যানেজারটা, সেই তো। আবার কে ?" কালীকেষ্টর মুখখানা এবার কয়লার চেয়েও কালো হয়ে যায়ঃ "বলে কিনা, আমি কয়লা চুরি করি।"

এখন, কয়লা চুরির কথা কেউ বল্লে কালীকেষ্টর প্রাণে লাগে। কালীকেষ্টকে জোচ্চোর বলো, খচ্চোর বলো, ও সইবে, ডাকাত বলো, তাও হয়ত হাসিমুখে মেনে নেবে, কিন্তু কয়লা-চোর বল্লে ও আহত হয়।

আর সত্যি বল্‌তে, সে আর কী এমন কয়লা সরায় ? বারোটার সময় খেয়ে দেয়ে ল্যরী নিয়ে বেরিয়ে সরকারী ডিপো থেকে ছ'টিন কয়লা সে নেয়, তারপর ঘুরে ঘুরে সেই কয়লার থেকে টন্‌ ছুয়েক এর কাছে ওর কাছে তার কাছে পাচার ক'রে সন্ধ্যে নাগাদ কারখানায় গিয়ে পৌছয়। সারাদিন খাটুনির পর কারখানায় কুলীরা তখন শ্রান্ত ক্লান্ত, আর যে ওভারসীয়ারটি কয়লা বুঝে নেয় তারও তখন মাথার ঠিক নেই, সেই যোগাযোগে অবশিষ্ট কয়লার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে কালীকেষ্ট চলে আসে।

কাজ করার গুমোরে সদাই ডগমগ, এমন এক একটি লোক থাকে। ওভারসীয়ারটি হচ্ছে সেই গোছের মানুষ। একতিল

কাজকে একতাল করে না বল্‌তে পারলে তার সুখ নেই। সারাদিন ধরে কতো কাজ তাকে করতে হচ্ছে সর্ব্বদাই তার মুখে লেগে আছে। কাজেই হাজার রকমের কার্য্যকারিতার পর দিনান্তে যখন কালীকেষ্টর ল্যরী গিয়ে দাঁড়ায়, আর কুলীদেয় সাহায্যে তদারক করে সেই কয়লা বোঝার পর বোঝা তাকে নামাতে হয় তখন স্পষ্টতই তাকে চেঁচিয়ে বল্‌তে শোনা যায়—"বাবাঃ! এই কি ছ'টন কয়লা? ছ'টনের নাম করে ছত্রিশ টনের বোঝা চাপানো হচ্ছে—তা কি আর আমি বুঝিনে? ভালো করছ না কালীকেষ্ট! কম বলে' ভুলিয়ে ভালিয়ে এই যে বেশী কয়লা চালিয়ে দিচ্ছ এ কাজ তোমার উচিত হচ্ছে না। কোম্পানীর উপকার করছ বটে, কিন্তু সাধু সরলবিশ্বাসী লোকদের ফাঁকি দিয়ে এইভাবে খাটিয়ে নেয়া ভালো নয়।"

"তা, ম্যানেজার তোমায় ধরলে কি করে'?" আমি জানতে চাই।

"আমায় ধরবে? ম্যানেজার? পাগল হয়েচ তুমি?" কালীকেষ্ট বলে: "আমায় ধরবে সামান্য একটা ম্যানেজার? তাহলে সাত জন্ম ওকে খনির গর্ভে আগে কয়লা হয়ে জন্মাতে হবে! ধরাধরি নয়, কেবল সন্দেহ করেছে এই মাত্র। আর তা ছাড়া, তুমি তো জানো, কালীকেষ্ট কখনো তেমন কম্ম করে না। সরকারী কয়লা সরাবে কালীকেষ্ট? এতটা কয়লাহারাম হয়নি সে!"

"না—না—তা কি হয়?" আমি সায় দিই।

"ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।"—কালীকেষ্ট বিবৃতি দেয়: "ডেকে বল্লে, 'কালীকেষ্ট, তোমার কয়লার ব্যাপারে আমি

মোটেই খুসি নই। এর মধ্যে গলদ্ আছে—আমার কানে অনেক কথা এসেছে।' আমি শুনলাম কিন্তু কিছু বল্লাম না। সব্‌সে চুপ্‌ ভালা বলে' একটা কথা আছে। বোবার শত্রু নেই, এও আমি জানি। আমি চুপ্‌ করে' রইলাম। ম্যানেজার নিজেই বল্‌তে লাগলো, 'আমার বিশ্বাস আমাদের কয়লা তুমি অন্যান্য জায়গায় বিক্রি করছ।' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি বল্লাম, 'মশাই, আপনার ওভারসীয়ারকে ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন—'

'আমার কোনো সাক্ষী সাবুদের দরকার করে না। আমার দৃঢ় ধারণা যে আমাদের কয়লা তুমি অন্য কোথাও পাচার করছ। কেবল তোমাকে হাতে নাতে পাকড়ানো দরকার। একটু প্রমাণ পেলেই তোমাকে আমি সোজা আদালতে খাড়া করবো, ঠিক জেনে রেখো।'

"তুমি কী করবে ভেবেছ তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করি। —"আদালতে সোজা হবে?"

"না, আমি একবার সেই ওভারসীয়ারের সঙ্গে কথা কইতে চাই। ম্যানেজার তাকে তলব করতে পারে, তার আগেই তাকে তৈরি করে' রাখা দরকার।" বল্ল কালীকেষ্ট: "এই পথ দিয়েই সে কাজে যায়—তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

"ঘুষ ঘাস দিয়ে বুঝি—" আমি ইঙ্গিত করি।

"ঘুষ? ঘুষ কেন? আমি কি কোনো বে-আইনি কাজ করেছি যে ঘুষ দিতে যাবো?"—কালীকেষ্টকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখায়।—"তাছাড়া, ঘুষ দেওয়াটাও বে-আইনি।" সে বলে।

"বিষে বিষক্ষয়।" আমি বাৎলাই।—"উপায় কি?"

"রামোঃ! কালীকেষ্ট সে বান্দাই নয়। কোনো অন্যায় কাজ তার কুষ্ঠিতে লেখে না। আর তাছাড়া—কী বল্লে? ঘাসের কথা কী বল্লে? কতো কষ্টে যে ঘাস যোগাড় করতে হয় তা আমিই জানি। তাতে আমার পাঁঠারই কুলোয় না—তাই থেকে যে আমি তোমার ওই সাধের ওভারসীয়রকে খাওয়াতে যাব—"

বল্‌তে বল্‌তে কালীকেষ্ট অদূরে সেই ওভারসীয়ারের ছাতা দেখতে পায়।

"ওহে ওভারসীয়ার, শোনো শোনো। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে", হাঁক পাড়ল ও।

কাছে এল ওভারসীয়ার। "কিসের কথা?"

"আমি তোমাকে সাবধান করে' দিতে চাই। কাজে অবহেলার চাপ আসবে তোমার ঘাড়ে—আগে থেকেই তা জানিয়ে দিচ্ছি।" কালীকেষ্ট বলে।

কাজে অবহেলা? কেজো লোকের নামে এহেন অভিযোগ, এতে সে বিস্ময় বিমূঢ় না হয়ে পারে না। ওভারসীয়ার হাঁ হয়ে যায়।

আমি ওভারহিয়ার করতে থাকি।—"গত কাল তুমি কয়লা খতিয়ে নাও নি। ম্যানেজার সেজন্যে খুব খাপ্পা হয়েছেন।" কালীকেষ্ট জানায়।

ওভারসীয়ারের হাঁ বুজে আসে। "কেন, কয়লা তো ঠিকই ছিল, কালীকেষ্ট!" সে বলে।

"সে কথা বল্লে তো চলছে না। আমি তো ঠিকই দিয়েছি আমি জানি। কিন্তু তোমার তো কর্ত্তব্য ছিল খতিয়ে নেওয়া। তুমি তা করোনি, তোমার কোম্পানির কাজে অবহেলা করেছো। আর সেই কথাই ধরেছেন ম্যানেজার।"

ওভারসীয়ারের চোয়াল ঝুলে পড়ে। সে কী বল্‌বে ভেবে পায় না। কিম্বা সে যা ভাবে বল্‌তে পারে না।

"আজ তুমি কারখানায় গেলেই ম্যানেজার তোমাকে ডাক্‌বেন। কালকে কতো কয়লা খালাস করেছিলে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন তোমায়। এখন, তুমি তো জানো না যে কতো নামিয়েছিলে—অতএব কী মুস্কিলে পড়বে, বুঝতেই পারছো। কিন্তু যেহেতু তুমি বন্ধু মানুষ—বিপদে পড়ো এটা আমি চাই না, গোড়ায় খবর পেয়ে আগে ভাগেই তোমায় হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি তাই। আমি তোমাকে ছ'টন কয়লা দিয়েছিলাম, মনে রেখো। তুমি ম্যানেজারকে বল্‌বে তুমি ছ'টন কয়লা ওজন করে খতিয়ে দেখে নিয়েছ। ম্যানেজার আমায় জিজ্ঞেস করলে আমিও বল্‌ব যে হাঁ। বল্‌ব যে তুমি খতিয়ে ওজন করে নিয়েছ। তোমার কথায় আমার সায় দেবো, বুঝেছ? তাহলেই তোমার আর কোনো বিপদ হবে না। আমি তোমায় বাঁচিয়ে চলব। নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে আমার কেমন দহরম মহরম—জানো তো?"

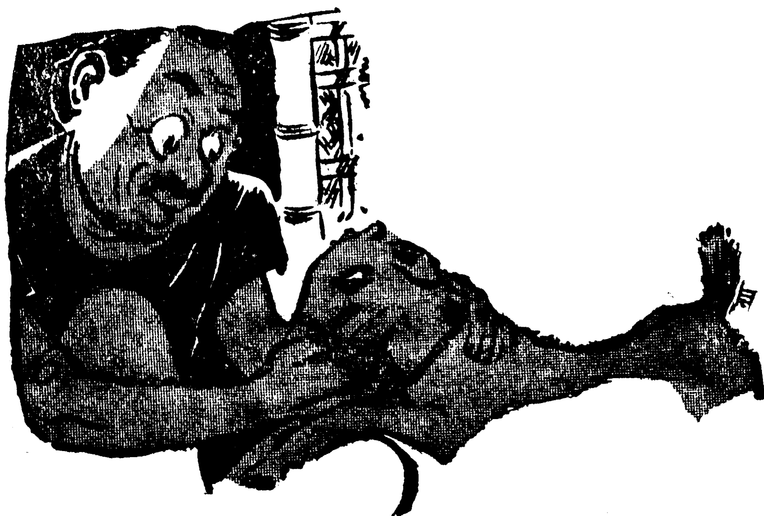
"সত্যি, কালীদা, কী বলব তোমায় আমি—! তুমি যা বাঁচান্ আজ আমায় বাঁচালে—!" ওভারসীয়ার হাঁফ ছেড়ে ভ্রাতৃবৎ হয়ে পড়ে।

"কিছু না—কিছু না! কিছু বলতে হবে না, এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। বন্ধুর কর্ত্তব্য করেছি মাত্র, বেশী আর কি? বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী ছাখে না, সেইতো দুঃখ। কেবল কে কটা বাড়ী তুলছে তাই ছাখে, আর বুক ফেটে মরে। কিন্তু আমি বলি—" এই বলে আমার দিকে সে 'বঙ্কিম'-দৃষ্টিতে তাকায়—"বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না দেখিলে কে দেখিবে?...কয়লার ব্যবসা করি বলে' মনটাকে তো আর কয়লার মতো করতে পারিনি ভাই!"

ওর বেশী বলতে হয় না। কালীকেষ্ট-কথামৃত পান করে চাঙ্গা হয়ে খরখর করে কারখানার দিকে পা চালায় ওভারসীয়ার।

"দেখলে তো।" এবার আমাকে সম্বোধন করল সেঃ "এরা কিরূপ না জেনে বিপদে পড়ে—নিজের চোখেই দেখলে! কি করবো, আমাকেই সামলাতে হয়। ওরা মুস্কিল ডেকে আনে আর আমাকে মেটাতে হয়। কি করি—না করে রেহাই কোথায়? জেনেশুনে তো আর বাছাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। আমাকে ওরা পিতৃতুল্য জ্ঞান করে। আমিও ওদের ঠিক সেই চক্ষে দেখি—পুত্রবৎ মনে করি।...আয় বাবা, আয়।"

এই বলে' সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কয়লাক্লেদমুক্ত, নিরতিশয় ন্যায়নৈষ্ঠিক, পরহিতচিকীর্ষু-কালীকেষ্ট পাঁঠা সমভিব্যাহারে নিজের আড়তের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।



লেখকের কলম



বাইশ বছরের মল্লনাথকে বিয়াল্লিশ বছরে মল্লিনাথ হতে দেখা গেছে, প্রথম যৌবনে যাঁর টিকি ধরে টান্‌তে কসুর করে নি তাঁরই পাদটীকায় শেষ জীবনটা প্রায়শ্চিত্ত করে' কাটালো এমনটা যে দেখা যায় না তা নয়, তবু অমুর লেখক-জীবনের যে রূপান্তরের কথা তার অমুক আত্মীয়ের মুখে এই মাত্র শোনা গেল তা কল্পনা করাও কঠিন। সজারুও কায়দায় পড়লে সোজা হয়ে আসে, দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছও দাঁড়ায় না। কিন্তু প্রতিভাবান অমু যে নিজের প্রতিভা এমন করে' বিশ্বের দিকে, দিগ্বিদিকে. বিশ্বপ্রাণের উদ্দেশে বিলিয়ে দেবে (বিশ্বপ্রাণীর এতখানি সতর্কতা সত্ত্বেও) তা কে ভাবতে পেরেছিল? অমুর ঐ নিকট আত্মীয়টি তো কখনই নয়।

"কেমন গল্পটা? ভালো?"

এক মনে পড়ছিলাম, অতর্কিত প্রশ্নে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে চম্‌কে উঠ্‌তে হোলো। সাম্‌নের আসনের ওয়াটারপ্রুফ্‌-ওয়ালা ভদ্রলোকই সন্ধিৎসু হয়েছেন।

কামরায় দুটি মাত্র জীব—এক উনি আর অদ্বিতীয় আমি। সন্ধি করার কিন্তু কিছুমাত্র অভিসন্ধি আমার ছিল না। নির্জীবের মতো উত্তর দিলাম—মন্দ নয়।

পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, বাসায় ও রেলের কামরায় নিঃসঙ্গসুখলাভ সকলের বরাতে লেখে না। এখানেও এই ভদ্রলোককে আলাপ জমানোর জন্য নাছোড় দেখা গেল।—"অমন মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন —তাই জিজ্ঞেস করলাম।" তিনি বললেন।

"এমনিই পড়ছিলাম—সময় কাটানোর জন্য।" বলেই আবার

পড়া সুরু করলাম, কিন্তু ক' মুহূর্ত্তই বা! আমার নিরুৎসুক জবাবে আহত না হয়ে ভদ্রলোক পুনরাক্রমণ করেছেন।

"লেখা কাজটা মন্দ নয়। বেশ পয়সাও আসে।" বল্‌তে শোনা গেল তাঁকে—একটু যেন মুরুব্বির চালেই।—"অবিশ্যি, যদি বড় দরের লিখিয়ে হওয়া যায়।"

সায় দিলাম আমি।—"হ্যাঁ, ঐটেই সোজা উপায়।"

লেখার বদলে পয়সা কামাতে হলে বড় দরের লেখক হওয়াটাই সর্ব্বপ্রথম এবং সব চেয়ে সহজ পন্থা, কে না জানে।

"আমার ভাই অমুও একজন লেখক।" জানালেন তিনি: "তার কথাই বল্‌ছি আপনাকে, শুনুন্।"

অমুর কথা জানবার আমার একটুও ঔৎসুক্য ছিল না, কিন্তু ইচ্ছা না থাক্‌লেও যেমন বজ্রাঘাত আর টাক্ মাথা পেতে নিতে হয়, তেম্‌নি নিরাসক্ত ভাবে অনিবার্য্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হোলো। মাসিক পত্র মুড়ে আমি হাই তুললাম, ঘুম্ ঘুম্ আমেজ আনলাম চোখে মুখে, ভদ্রভাবে বৈরাগ্য আর নিদ্রালুতা জানানোর যতটা ইঙ্গিত করবার করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না, ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন।

"আইডিয়াটা মা'র মাথাথেই জেগেছিল প্রথম। অমুর সাহিত্যিক জন্ম—মানে, দ্বিজত্ব লাভও মা'র থেকেই। মা'র মতন অমন সাহিত্য-গতপ্রাণা আমি দেখিনি। তার কারণও একটু ছিল। আমার বাবা এক আধটু লিখতেন, নিজের খেয়ালেই। রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর রোজ তিনি লিখতে বস্‌তেন—আমার কলম আর একখানা উত্তরীয় টেনে নিয়ে। উত্তরীয়টা কেন নিতেন যদি প্রশ্ন করেন, তার উত্তর আমি দিতে পারব না। আমি বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম,

বাবা, তুমি লেখবার আগে চাদরটা অমন করে' গলায় বাঁধো কেন? বাবা ভারী চটে গেছলেন, বলেছিলেন—চাদর? বাঁদর, তুই এটাকে বলিস্ চাদর? এর নাম হচ্ছে উত্তরীয়। হনুমানের যেমন ল্যাজ্ তেমনি প্রত্যেক জাত-সাহিত্যিকের এই উত্তরীয়। দেখছিস্ এখন আমি লিখ্‌তে বস্‌ছি—উত্তরীয় ছাড়া লেখক হওয়া যায়?

লেখকের পক্ষে উত্তরীয় অপরিহার্য্য কেন, এ নিয়ে আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। আমার মনে হয়েছে ওটাকে ব্লটিং পেপারের কাজে লাগানোর জন্যই বোধহয়। উত্তরীয়দের শোষণ-ক্ষমতা প্রায় জমিদারদের মতই। তাছাড়া, আমার ঝর্‌ণা কলমটায় কলমের চেয়ে ঝর্‌ণার বাহাদুরি বেশি ছিল—উত্তরীয় বা ব্লটিং একটা কিছু না থাক্‌লে এক হাত এগুনোই যেত না।

বাবা গল্প লিখ্‌তেন—ছোট গল্প, বড় গল্প, মেজ গল্প। লিখে লিখে তাক্ করে' সম্পাদকদের দিকে তিনি ছুঁড়তেন। কিছুদিন পরে দেখা যেত সেগুলো আবার তাঁর নিজের তাকে ফিরে এসেছে। সঙ্গে একখানা করে' চিরকুট—লেখাটা ভালো, তবে তাঁর মত লেখকের কলম থেকে এর চেয়ে আরও ভালো লেখা তাঁরা আশা করেন। বাবা তার চেয়ে আরো ভালো লেখা লিখতে বস্‌তেন আবার—কিন্তু সম্পাদকদের সেই সর্ব্বনেশে চাহিদা কোনো দিন তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। এইভাবে, তাদের এবং তাঁর নিজের বাসনা অপূর্ণ রেখেই একদা তিনি কলমরক্ষা করলেন।

বাবার সমস্ত লেখা মা জমিয়ে রাখতেন। আর পড়তেন মাঝে মাঝে। বিরলে বসে লোকে যেমন করে প্রিয়ার চিঠি পড়ে অনেকটা সেই রকম। আমিও পড়ে দেখেছি। মোটেই প্রিয়ার চিঠির মতন

নয়। বড় মেজ সেজ যে গল্পই হোক্—সবই সেই একঘেয়ে ব্যাপার। তবে আপনি বল্‌তে পারেন বটে যে, প্রিয়ার চিঠিরাও তো একঘেয়ে। সেকথার আমার কোনও জবাব নেই। মা'র মতে বাবা ছিলেন বিরাট এক প্রতিভা—দেশের লোক তাঁকে চিন্‌তে পারল না। কিম্বা চিন্‌তে পারত, মুখপোড়া সম্পাদকগুলোই চিন্‌তে দিল না। আমার মনে হয়, বাবা যে অতো লিখ্‌তেন—মা'র উৎসাহই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। বাবার রচনার মূলে ছিল মার প্ররোচনা। 'তোমার সেই লেখাটা শেষ করে গেলে না,' এই বলে' এমন কি, অন্তিমকালেও বাবাকে তিনি প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন, এবং এই কথায় বাবাকেও যেন একটু চাঙ্গা হতে দেখা গেছল, একটু প্রলুব্ধ বা প্রবুদ্ধ যাই বলুন! তাঁর পুনরুদ্দীপনা দেখে ডাক্তাররাও বেশ উৎসাহ পেয়েছিলেন, কিন্তু বলা যায় না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে আর ফেরানো গেল না। কলম এবং উত্তরীয়ের মায়া ত্যাগ করে' তিনি চলে গেলেন।

বাবার মারা যাবার পর মা'র নজর পড়ল আমার দিকে। সাহিত্যের মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল—বাবার ধারা বজায় রাখার দায় তিনি অসহায় আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন। অথচ আমরা কোনও দোষ করিনি। বাবার উত্তরাধিকার—উত্তরীয়ের অধিকার আমি নিতে পারব না, সাফ্ বলে' দিলুম। আমি ইঞ্জিনীয়ার হতে চাই শুনে মা এমন আহত হয়েছিলেন যে বল্‌ব! কিন্তু অমুর সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আছে দেখা গেল। সে বললে: 'আমি বাবার মত লেখক হবো।' এই কথায় মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

অমুর ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার দিকে ঝোঁক। আমার চেয়ে সে

বছর কয়েকের ছোট—কিন্তু হলে কি হবে, যে সব বই আমার হাতে নিতেও ভয় করত, সে সব যেন তার কাছে অবাক্ জলপান। শিশু পাঠ্য থেকে সুরু করে' বড়দের পাঠ্য নাটক নভেল কিছুর তার বাছবিচার ছিল না। সব বই ছোটদের পড়তে দেয়া অভিভাবকরা পছন্দ করেন না—কিন্তু আমার মা'র আর অমুর বেলায় তার অন্যথা দেখেছি। আমি যে বই ছুলেই তিনি হাঁ হাঁ করে' আসতেন, পাছে আমি পড়ে বখে যাই—সে সব বই অমু অকাতরে পড়ত। তাকে মা কিছু বল্‌তেন না। আমাকে বল্‌তেন, লেখকের অপাঠ্য বলে' কিছু নেই। যা খুশি না পড়লে সে যা খুশি লিখ্‌বে কি করে'? ওরা যে বাণীর বরপুত্র! বাণীর বরপুত্ররা মায়ের ছোট পুত্র হলেও তাদের জন্য কোনো বাধানিষেধ নেই, এই তত্ত্ব অতি অল্প বয়সেই আমি জেনেছিলাম।

অতএব অমুকে আঁটা কঠিন হোলো। ইস্কুলে পড়তে অমু বরাবর বাঙলায় সব চেয়ে বেশি নম্বর পেত, আর আমি সবার কম। ইস্কুলে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল—সে সব পুরস্কার যেন অমুর জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। অমু তার সব প্রাইজ্ এনে মা'র হাতে দিত আর মা অমুকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে' মনে করতেন। মনে করতেন, অমুও একদিন তেলামাথা নিয়ে বিলেতের নোবেল-তলায় পুরস্কার কুড়োতে যাবে।

না, মশাই না। মোটেই ন্যাড়া নয়। কথার কথায় বল্‌লাম। অমুর যেমন লেখকের মতন চাল ছিল, তেমনি চুলও ছিল। আর, তেলা কী বলছেন, মাথায় সে তেলই দিত না মোটে। মাথার দিক দিয়ে সে রবিঠাকুরের মতই চুলে চুলে ফেঁপে উঠেছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পোষার মতন অবস্থা ছিল না আমাদের। তবুও

অমুর জন্য খরচ করতে মার কোনো কার্পণ্য দেখিনি। আমি যখন অর্থাভাবে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ঢুক্‌তে না পেরে, বিকল্পে, স্থানীয় একটা কারখানায় ঢুকে একাধারে হাতে-কলমে—টেক্‌নিক্যাল্‌ বিদ্যা আর টাকা উপায় করতে বাধ্য হলাম—মা তখন আমার সেই কষ্টার্জিত টাকার থেকে কলেজে পড়বার জন্য অমুকে কলকাতায় পাঠালেন। কলকাতায় বড় বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে অমু তাদের মত হবার সুযোগ পাবে এরূপ আশা মা পোষণ করতেন। পাড়ার লোকরাও তাঁকে ওস্‌কাতো—বলত, তোমার অমু তুখোর ছেলে—অনেক দূর ওর দৌড় হবে। এবং হয়েছিলও ; অমু শেষ অবধি—যে করেই হোক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল।

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরুনো না পেরুনোর সঙ্গে লেখক হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। অমু পাশ করতে পেরেছিল কিনা, সেটা কোনো কথাই নয়—ওর লেখক হওয়াটাই আসল কথা। আর অমু যে লেখকের কলম নিয়ে জন্মেছে, আমার মা'র কৃপায়, সেকথা কার অজানা বলুন্‌ ?

কলেজের পড়াশুনা তারপর—চৌকাঠে সেই হুম্‌রি খেয়ে পড়বার পর—সে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা শুনলাম। কিন্তু বাড়ীতে সে এল না, কলকাতাতেই থেকে গেল। মাঝে মাঝে তার চিঠি আমরা পেতাম, তাতে খবর কিছু থাক্‌ত না, কেবল সে ভাল আছে, আর লিখে চলেছে—এই কথাই লেখা থাকত। তার এই ধরণের চিঠি এলে মা যেন হাতে চাঁদ পেতেন! তাঁর ছেলে যে একজন লেখক হতে চলেছে এতেই তাঁর আনন্দ ধরত না।

ইতিমধ্যে আমি সেই কারখানায় লেগে থাক্‌লাম। ঘষতে ঘষতে

সেখানকার হেড টেক্‌নিসিয়ান্‌ হলাম একদিন—তারপর সেখান থেকে একটা সুযোগ পেয়ে চলে গেলাম টাটায়। আমার ইঞ্জিনীয়ার হবার ছেলেবেলার স্বপ্ন অবশেষে সফল হোলো। টাটা থেকে বেরিয়ে পাটনার নামজাদা এক কণ্ট্রাক্টরি ফার্মের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে এক কাজ পেয়ে গেলাম। বেশ বড় চাক্‌রি, বেতনও মোটা, কিন্তু তবু তাতে মার মনে দাগ লাগ্‌ল না। অমুই ছিল মার অমিয়—অমু লেখক! অমু বাপের মুখোজ্জ্বল করে' বিশ্ববিখ্যাত হবে, অমু বংশের ধারা বজায় রেখেছে। ইত্যাদি। কিন্তু অমু কেবল টাকা চেয়ে পাঠাত—আরও বেশি বেশি আর ঘন ঘন। অবশ্যি পত্রপাঠ তার টাকা পাঠানোর অন্যথা হোতো না। "এক্ষুনি এক্ষুনি ও লিখে রোজগার করবে এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না," মা বল্‌তেন আমায়ঃ "লিখে নাম হলেও টাকা হয় না। তোমার বাবাকে কি রকম সাধনা করতে হয়েছিল ভেবে ছাখো।"

এই লিখে গাদা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত টাকার তাগাদা অবশেষে একদিন বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। চিঠির সুরও বদ্‌লে গেল অমুর। 'ভালো আছি' এবং 'এখনও লিখছি' একঘেয়ে এরূপ সংবাদের বদলে 'লিখেটিখে মন্দ হচ্ছে না' 'চলে যাচ্ছে এক রকম' এই ধরণের কথা দেখতে পাওয়া গেল। সে যে সত্যিই রোজগার করতে সুরু করেছে সেটা জানা গেল। মা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এতদিনে প্রথম ধাপটা অমু পেরুতে পেরেছে। এইটেই খুব শক্ত ধাপ। তোমার বাপ তো—"

আমার বাবা যে প্রথম ধাপ পার হতে পারেন নি, সেটা জানাবার দরকার ছিল না। মফস্বলের লোক না হয়ে কলকাতায় বাস করার

সুযোগ পেলে হয়তো বাবা সাহিত্যের এই প্রথম ধাপে পা দিয়ে, আর না এগিয়েই, সাহিত্যিক ধাপ্‌পা দিয়ে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তেমন বরাত করে আসেন নি। কিন্তু অমুর বরাত ছিল বল্‌তে হবে। তারপরেও তার চিঠি আস্‌তে লাগলো। 'একরকম চলে যাচ্ছে' 'মন্দ হচ্ছে না'—ইত্যাদির বদলে 'ভালোই হচ্ছে, বেশ উপায় করছি,' এই ধরণের কথাবার্তা আমরা পেলাম। ধাপের পর ধাপ সে যে অকাতরে লাফিয়ে চলেছে, পরের পর চিঠির তার বাক্যালাপ থেকে সেই সব পরিচয় পৌঁছতে লাগল।

এই সময় সহসা মা'র অসুখ করল। তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না—হঠাৎ ভেঙে পড়লেন একেবারে। ডাক্তারকে খবর দোয়া হোলো —এবং অমুকেও। অমু এল—ট্যাক্সি করে'।

কলকাতা থেকে সটান্ ট্যাক্সি হাঁকিয়ে আসা—কম কথা নয়। এবং অমুর বেশভূষাও সেই কথার সাক্ষ্য দিল। নিখুঁৎ সাহেবি পোষাকে সুসজ্জিত অমুকে দেখলে, সত্যিই যে তার ভাল চল্‌ছে, সেকথা স্পষ্টই বোঝা যায়। যতোখানি ভাল চলার ধারণা আমার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশিই বলতে হবে। এবং তার হাবভাব দেখলে, কোনো দুঃখ বা দুর্ভাবনা যে দুনিয়ায় তার কিম্বা কারো আছে তা মনে হয় না।

রোগশয্যায় শুয়েও মা'র অমুর জন্য আগ্রহের অন্ত ছিল না। কী লিখছে, কিসে লিখছে, কেমন লিখছে—এই সব প্রশ্ন। 'খবর কাগজে আর মাসিক-পত্রেই বেশির ভাগ,' বলল অমু। 'পড়ে শোনা তোর লেখা'—বললেন মা। কিন্তু মার উত্তেজনার কারণ হবে বলে' ডাক্তার বাধা দিলেন। অমুর লেখা না শুনেই মাকে কান বুজতে হোলো শেষটায়।"

এই পর্যন্ত বলে' ভদ্রলোক জানালার বাহিরে তাকিয়ে থাক্‌লেন। তারপরে মুখ ফিরিয়ে সম্বোধন করলেন আমায়ঃ "সত্যি মশাই, অমুর লেখবার শক্তি অসাধারণ। লেখকের কলম নিয়ে যে সে জন্মেছিল



অমুর অভ্যুদয়

তাতে ভুল নেই। কি মাসিক, কি দৈনিক, আর কি সাপ্তাহিক হ্যানো কাগজ নেই যাতে অমুর লেখা বেরয় না—তা জানেন?"

"অমুর পুরো নামটা কী বলুন তো?" আমি জানতে চাইলাম।

"অমর জীবন রায়।" তিনি জানান্ : "শুনেছেন কি এ নাম?"

"আমার জীবনে না।" দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি।

"কি করে' শুন্‌বেন? যত লেখা ওর বেরয় তার কোনোটাতেই ওর নাম দিতে দেয় না তো! লেখকদের ওপর অবিচার চিরকাল ধরেই চলে আসছে, অমু কিছু তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তবে বাবা লিখে কখনও টাকা পান্‌নি, ছাপাও হয় নি তাঁর লেখা,—অমুর লেখা ছাপার অক্ষরে দেখা যাচ্ছে—টাকাও পাচ্ছে, এই যা।"

ব্যাপারটা কিরূপ, জানবার আমার কৌতূহল হয়।—"যথা?"

"এই যেমন দেখুন না—আপনার ওই কাগজখানাতেও অমুর লেখা রয়েছে। দাঁড়ান, দেখিয়ে দিচ্ছি—" বলে' তিনি নিজেই দাঁড়ালেন। নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে' নিয়ে, কাগজখানা নিলেন আমার হাত থেকে—"সাম্‌নের স্টেশনেই নামব কিনা আমি।…ওঃ, এই পত্রিকাটায় তো বিস্তর লেখা দেখছি অমুর।—" পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে উনি বললেন—"থাক্, এই—একটাই পড়ুন—এতেই অমুর অপরাজেয় কথাশিল্পের যথেষ্ট পরিচয় পাবেন।"

আমি সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের মুখে চাইতেই তিনি বললেন—"হ্যাঁ, আমার ভাই অমু, এই সবই লেখে। আচ্ছা আসি, নমস্কার, এইবার আমায় নামতে হবে।"

তিনি নেমে গেলেন। তাঁর কথায় চাহনিতে এতক্ষণ ধরে যেন একটা ঈর্ষার ঝাঁজ পাচ্ছিলাম! সেটা অমুর লেখক-প্রবঞ্চনা বা নিজের মাতৃস্নেহ-বঞ্চনা কিসের জন্যে কে জানে!

তাঁর অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট ঝাঁঝালো লেখাটা আমি পড়লাম। যা পড়লাম তা হচ্ছে এই :

বলদ রসায়ন

বলদের জন্য নয়, বললোভীর সেব্য। দুর্বলের বলদাতা—বলবানের বিলাস। বল দেয় বলেই এই মহৌষধের নাম বলদ—এবং এর মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই। ভীমের তুল্য বলবান হতে চান ? তার দুটি মাত্র পথ : হয় ব্যায়াম করে' হিম্‌সিম্ খান, নয় আমাদের এই বলদ রসায়নের সকালে এক দাগ বিকালে এক দাগ সেবন করুন। তারপর আর আপনাকে দেখতে হবে না, আপনিই সবাইকে দেখে বেড়াবেন। বল লাভের পক্ষে এই রসায়নের পথটাই রাজপথ সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব সোজা রাস্তায় আসুন! 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'—শাস্ত্রে এবং প্রবাসীতে এই কথা লেখে। কিন্তু সেই সব উপাদেয় আত্মা যেমন বলহীনের লভ্য নয় তেমনি বলদ রসায়নবিহীনের পক্ষেও তাদের পাত্তা পাওয়া দুর্লভ।......



শিক্ষাদীক্ষার ঘোরালো পথ



শিক্ষার কোনো রাজপথ নেই। সারাজীবনই হচ্ছে শিক্ষা পাবার জন্য। শিক্ষালাভই আমাদের গোলোকধাম, সত্যিই ; কিন্তু তার পথটা হচ্ছে গোলোকধাঁধার। সে-পথের অলি-গলি, ঘোর প্যাঁচ সবই আমার কাছে রহস্যময়।

শিক্ষার সমস্যা নানাবিধ। শিক্ষা দেয়ার সমস্যা, শিক্ষা পাওয়ার সমস্যা এবং শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষালাভ করার আরেক সমস্যা !

হাতেখড়ির থেকে সুরু হয়ে প্রতিপদে দেখা দিয়ে শিক্ষার পূর্ণিমা (কিম্বা অমাবস্যা) পর্যন্ত তার জের চলে—এই দোরোখা টানা-পোড়েনের মধ্যে শিষ্যের চেয়ে গুরু হওয়ার সমস্যাটাই গুরুতর ! ওর ষোলো কলার একটা কলা আমার ভাগ্যে একদা দেখা দিয়েছিল। সেই কদলী-দর্শন মর্মান্তিক।

জনশিক্ষার খুব হুজুগ চল্‌ছিল তখন। আমাদেরও কয়েকটি পাড়া মিলিয়ে একটা জনশিক্ষা-সমিতি খাড়া করা হয়েছিল। তার সভাপতি (আসলে তিনি জনশিক্ষাদানের ঘোর বিরোধী) একদিন ডেকে পাঠালেন আমায়।

গেলাম। যেতেই তাঁর ধিক্কারধ্বনি শুনতে হোলো—"আরে ছ্যা ছ্যা ! পাড়ার কোনো ধারে তো পা ফেলার যো নেই। কোথাও চুবড়ী বুন্‌ছে, কোনোখানে মূর্তিশিল্প, কোথাও বা হিন্দি-শিক্ষা, কোনো-জায়গায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কোথাও আবার রাজনীতির ব্যাখ্যা। কিন্তু তোমার পাশেই যে একটা আকাটমুখ্যু রয়েছে তার খবর রাখো ? নিজের নামটা পর্যন্ত বানান করতে জানে না। আগে নিজের ঘর সামলাও, তারপর তো বিশ্বের লোককে শিক্ষা দেবে !"

পাশের বাড়ীকে নিজের ঘরের মত মনে করতে স্বভাবতই

আমার দ্বিধা থাকলেও নিজের দোষ ঘাড় পেতে নিলাম। কিন্তু তিনি বল্লেন—"ও মুখের দুঃখ প্রকাশ করে' কোনো লাভ নেই। লেখাপড়া শেখাও লোকটাকে। পারোতো আজ থেকেই লেগে যাও। বেচারার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—যুগ যুগ ধরে যে জ্ঞানভাণ্ডার, যে রসের খনি সঞ্চিত হয়ে পুঞ্জীকৃত হয়ে উঠল, তার কোনো পাত্তাই সে পাচ্ছে না—সব স্বাদ সমস্ত সুযোগে বঞ্চিত। আহা! ভাবতেও প্রাণে ব্যথা লাগে! যাও, আর দেরি কোরো না। লেগে পড়ো গে!"

বলেই কথাটা তিনি শুধরে দিলেন—"মানে, লেগে পড়াও গে! আরে, ভেবে দেখলে আসলে তো তোমারই লাভ—শেষ পর্যন্ত! তুমি যখন লেখক, তখন তোমারই তো একজন পাঠক বাড়লো। কালেক্কে ও তোমার বইও এক আধখানা কিনতে পারে।"

তা বটে······! তক্ষুনি ফিরে এসে আমি সেই বাঞ্ছনীয়ের খবর নিলাম। নাম তার পার্থ, বেশ তাক্‌লাগানো নাম এবং দেখা গেল নামের বানান সত্যিই তার জানা নেই, মানে তো দূরে থাক্! শিক্ষালাভের তার নিতান্ত প্রয়োজন তার সন্দেহ কি!

কিন্তু শিক্ষালাভ করা তার পক্ষে সুকঠিন। পাশের বস্তিতে থাকলেও কেন যে সে সর্বদা আড়ালে থাকে, এবং কেন যে আমার নজর এড়িয়েছে তারও কারণ জানা গেল। মাঝে মাঝে সে ডুব মারে—দিনকতকের জন্য। কোথায় যে যায় বলা যায় না। তারপর ফিরে এলে দেখা যায় পুলিশ তাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জেল হাজত থেকে ফিরে এসে দুদিন বাদে আবার সে উধাও! এবং ফের আবার ফিরতে না ফিরতেই পুলিশ! এরকম হর্‌দম্ যাতায়াতকারী

ছাত্রের কাছে রেগুলার আটেন্‌ডেন্‌সের যে কোনো আশা নেই, বস্তির অনেকেই সেকথা আমাকে সম্‌ঝিয়ে রাখল।

তবু পার্থকে ডাক দিলাম। ভেবেছিলাম, আসতেই 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' শ্লোকটা সরল বাঙলায় প্রাঞ্জল করে' ওকে বোঝাব, কিন্তু প্রয়োজন হোলো না, যুদ্ধের জন্য মারমুখী হয়েই সে এল।

গুরু হবার আগেই গুরুকে মারা বোধহয় গুরুমারা বিদ্যে নয়। কিন্তু তা না হলেও এমন ছাত্রের পক্ষে তাও অসম্ভব না, প্রথম দর্শনেই আমি টের পেলাম। তবুও গুরুগিরি করতে গিয়ে স্থুরুতেই পেছোলে চলে না—যতই পেছল পথ হোক্‌। পার্থের প্রতি প্রযোজ্য শ্লোকটা মনেমনে নিজেকে বলে' বুকে বল বেঁধে এগুলাম।



গুরু-শিষ্য-সংবাদ!

"শুনছি তুমি নাকি লিখতেও জানো না, পড়তেও পারো না?"

"না মশাই।" ঘাড় উঁচু করে ও বল্ল। বেশ জোরের সঙ্গেই।

"একথা ভালো নয়। খুব নিন্দার কথা। এতখানি বয়সে মুখ্যু হয়ে থাকার মত দুঃখু আর নেই। জানো তুমি কী হারিয়েছ, আর কী কী হারাচ্ছো?" বলে, থামলাম একটু,—তাকে চিন্তা করে' বিবেচনা করে' দেখবার অবকাশ দিলাম। কিন্তু সে যে সে বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল তা

মনে হোলো না। অগত্যা, আমাকেই বিশদ করতে হোলো: "লেখাপড়া শিখলে রাস্তার নাম বাড়ীর নম্বর তুমি পড়তে পারতে—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তোমার অপাঠ্য ছিল না। সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ তোমার সামনে উন্মুক্ত হোতো—তা জানো? তোমার কি বিদ্যালাভের চেষ্টা করতে ইচ্ছা হয় না?"

"একবার আমি সব কিছুই বাজিয়ে দেখতে রাজি আছি।"

"বাঃ, এই ত বেশ কথা! ভালো কথা।" আমি বল্লাম: "কিন্তু একবার চেষ্টা করার কাজ এ নয়, তোমাকে বারম্বার চেষ্টা করতে হবে; বিদ্যালাভ অত সহজ না। প্রথমেই এটা জেনে রাখো।"

পার্থ হাস্‌তে লাগল। অদ্ভুত এক হাসি! যাক্‌, যখন হেসেছে তখন ওর মন পাওয়া গেছে। এবার সেই মন পড়ার বইয়ে এসে বসলেই বাঁচি। দেশব্যাপী নিদারুণ অজ্ঞতার অন্ধকার, অন্তত কিছু পরিমাণে, ঘোঁচানো ঠিক না গেলেও, একটু যে ফিকে করা গেল, তাই ভেবেই আমি স্বস্তি পেলাম।

"আচ্ছা, কাল থেকে রোজ এক সময়ে তুমি আমার বাসায় আসবে। তোমার বই খাতা পেন্‌সিল সব আমি যোগাড় করে রাখব।"

এক সময়ে তো আসতে বল্লাম, কিন্তু কোন্‌ সময়ে এলে ভালো হয় আমি ভাবি। সময় আমার কই? সময়ের প্রতি আমার তেমন টান না থাকলেও সময়ের আমার খুব টান। আচ্ছা, ভেবে দেখা যাক্‌। সকালটা আমার তুলো পেঁজানোর ক্লাস, বিকেলটা চরখা কাটবার। তখন হয় না। রাত্রে আমাকে গীতার ভাষ্য করতে হয়—অবশ্যি বাংলা অন্বয়-অনুবাদ অনুসরণ করেই। আচ্ছা, দুপুরের হিন্দি-শিক্ষা আর সাইকেল-সাধনার মাঝখানে ঘণ্টাখানেক পাওয়া

যায় না? সেই সময়েই ওকে পড়ানো যাবে। সেই ভালো। ওর উৎসাহ তো দেখা গেছে, এখন দেখি কদ্দুর উন্নতি করে।

কিন্তু উন্নতি ঘোড়ার ডিম। পার্থ সে পাত্রই নয়। শিক্ষা আদানপ্রদানের সারাক্ষণ সে এমন বিরূপ ভাব নিয়ে বসে থাকে যে, মনে হয় যেন তার সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা করা হচ্ছে। গুরু শিষ্যের পার্থিব সম্বন্ধ স্থাপন করাই দুরূহ হয়ে ওঠে।

গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ দূরে থাক্, শিক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক পাতাতেই সে নারাজ। প্রেমের মত বইয়ো ধরে বেঁধে পড়ানো যায় না। বাঁধাধরা রাস্তায় চালানো ওকে দায়। একেই তো বিদ্যালাভের কোনো দরাজপথ নেই বলা হয়েছে, তাসত্ত্বেও লোক-চলাচলে, বেশীর ভাগ-বালকদের চালচলনে যাওবা একটা গলি পথ তৈরি হয়েছিল, সে পথ দিয়েও সে গলবে না। সেই চল্‌তি পথেও পার্থ 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। সোজা মুখস্থ পথ, গড় গড় করে' গড়িয়ে যাওয়া যায়, কোথ্‌থাও লাগবে না, আট্‌কাবে না—কিন্তু সেকথা কে ওকে বোঝায়?

সমিতির এক মুখপাত্র উপদেশ দিয়েছিলেন, রোম্যান টাইপে শেখাও। কথাটা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু মুখপাত্ররা বল্‌লে কি হবে, পাত্রর মুখ তো তাঁরা দ্যাখেন নি। তাঁদের তো দেখতে হয় না। কেবল রোম্যান কেন, দেবনাগ্‌রি, উড়ে, উর্দু কোনো টাইপই পার্থর সঙ্গে খাপ খাবার নয়। এক একটা টাইপ আছে যাকে বলে রং ফাউণ্ড, টাইপদের পংক্তিভোজ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে যাদের বাদ দিতে হয়, পার্থ তাদের সগোত্র। একেবারে অপার্থিব।

এহেন যখন অবস্থা, পাড়ার ডাক্তার আমায় তাড়া করলেন। তিনিও সমিতির একজন। বল্লেন—"তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের

সমিতির এক ছাত্র এসেছিল আমার কাছে—পার্থ তার নাম। বলছিল, রাত্রে তার ভালো ঘুম হয় না। তোমার শিক্ষাই নাকি এই রোগের জন্য দায়ী। ঘুমোলে কেবল বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি স্বপ্ন দ্যাখে—দ্যাখে যে, কিম্ভুত কিমাকার যতো লোক তাকে নাকি তাড়া করে আসছে।"

"কী ধরণের লোক?"

"তা আমি জানি না।" বল্লেন ডাক্তার: "তবে সেই লোকগুলো তাকে বই ছুড়ে ছুড়ে মারে। পার্থ বলে, পুলিশের মার সে সয়েছে, তাতে তার নিদ্রার ব্যাঘাত কোনোদিন হয়নি, কিন্তু এই বইয়ের মার তার অসহ্য। বল্‌ছে যে, এই ভয়েই সে বিয়ে করল না।"

"বইয়ের সঙ্গে বিয়ের কী?" আমি বিস্মিত হই। বই আর বৌয়ের মধ্যে কোনো বৈধ সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না।

"বইয়ে আর বউয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে স্পষ্টই বোঝা যায়," জানালেন ডাক্তার: "আর তার বিচিত্র কি! সাত দিন সাত রাত্রি তার ঘুম হয়নি, পাগলের মত চেহারা, পাগল হয়ে যেতে তার দেরি নেই—দেখলেই বোঝা যায়।"

আমারও পাগল হবার বাকী কোথায়! কিন্তু আমি নিরুত্তর রইলাম।

"অতো বেশী লেখাপড়ার চাপ দিয়ো না। স্বাস্থ্য আগে, জানো তো? তুমি শিক্ষিত না হলেও শিক্ষক মানুষ, শিক্ষাদানের মহৎ ব্রত ঘাড়ে নিয়েছো। তার ওপরে সাহিত্যিক! তোমাকে এর বেশি বলার দরকার করে না বোধহয়?"

ডাক্তার ছেড়ে দিতেই সমিতির সভাপতি এসে পাক্‌ড়ালেন—"কী, কদ্দুর এগুলো? অ আ ক খ লিখ্‌তে পারে?"

"না মশাই।"

"লিখতেও শেখেনি, পড়তেও শেখেনি, তবে কী লেখাপড়া শেখাচ্ছো ?"

"লেখাপড়া শিখতে ওকে রাজি করতেই একটু বেগ পেতে হচ্ছে কিনা ! তাই একটূ দেরি হচ্ছে। তা, ওকে আমি তৈরি করে' নেব।"

"হ্যাঁ, একটু চট্‌পট্ নাও। পার্থর মত নিরেট আমাদের পাড়ায় থাকা আমাদের কলঙ্ক। এখানে চাঁদ অনেকে আছেন বটে—" বাঁকা চোখের চোখা চাহনিতে তিনি আমার প্রতিই কটাক্ষপাত করলেন বলে' মনে হোলো—"কিন্তু এরূপ কলঙ্ক তাঁদের শোভা বাড়ায় না।"

এবার সত্যিই আমার রাগ হোলো। নিজের ওপর, পার্থর ওপর, পৃথিবীর ওপর। এরকম না-পড়ুয়া বদ্ ছেলে তো আমি জীবনে দেখিনি! না, আমায় মরীয়া হয়ে লাগ্‌তে হবে। অনেক ধেড়ে ছেলে দেখা গেছে, বিত্তালাভে বেজায় নারাজ, মোটেই সুন্দর ছেলে নয়, বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ লাভের জন্য শিক্ষার সুড়ঙ্গ কাটতে একেবারেই অপ্রস্তুত, কিন্তু তারাও সাইকেল-শিক্ষার বিজাতীয় লোভে পড়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগে পা ডুবিয়েছে। এগুতে এগুতে ক্রমশ আপদমস্তক ডুবে যাবে আশা হয়। সাইকেল শিক্ষা, সিনেমা পাঠ, ফুটবলের মরশুমে গড়ের মাঠ মক্‌সো—এসব কোর্স তো ওই জন্যেই রাখা। কিন্তু আমাদের পার্থ সে পদার্থই নয়। কোনো রূপ বিদ্যাতেই ওর রুচি নেই। কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখা যাক্। শিক্‌কাবাব খাইয়েও ওর শিক্ষাভাব দূর করা যায় কি না—ওকে বিদ্যার বিপথে আনা যায় কিনা দেখব এবার।

ওর জন্যে যদি নতুন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করতে হয় তাও করতে হবে। শ্রুতিলিখন বা দ্রুত পঠনের দ্বারা হবে না। লেখাপড়া

এখন নয়, লেখা দেখা আর দেখে লেখা থেকেই সুরু হোক্। প্রথমে ও নিজের নামটা সই করতে শিখুক। নিজের নামে কার না আসক্তি? সেই আসক্তি ক্রমশ বেড়ে শক্তিসঞ্চয় করে' সুশিক্ষা লাভের দিকে অশ্ববেগে না হলেও, গাধার চালেও যদি দৌড়য় তাই আমরা যথেষ্ট ভাবব। নাম সই করতে করতে নামের মোহ—নাম জাহির করার লোভ ওকে পেয়ে বসবে। তখন চাইকি, এখানে সেখানে, এ-বাড়ী ও-বাড়ীর দেয়ালে, সাধারণ শৌচাগারের গায়ে, মানে, সাধারণের সাহিত্য-চর্চ্চার সব আসরেই ওর নাম আমরা দেখতে পাব। কিছু আশ্চর্য নয়! নামের লোভে পাঠক রাতারাতি লেখক হয়, আর লেখক স্বয়ং প্রকাশক হয়ে পড়ে—পার্থ তো কী ছার্!

বাসায় ফিরে দেখলাম, পার্থ মুখ গোম্‌ড়া করে' বসে আছে।

"আচ্ছা, তুমি নিজের নাম সই করতে পারো?"

পার্থ ঘাড় নাড়ল। "কই, করো তো।" দিলাম খাতা কলম।

পার্থ একটা জিনিস আঁকলো—অনেকক্ষণ ধরে'। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওর কপালের শিরা আর হাতের পেশী ফুলে উঠল—ওই একখানা সই বাগাতেই। সইটা দেখে আমি অবাক! যোগের এক পাওয়ালা চিহ্নকে দুপায়ে দাঁড় করালে যা হয় তাই: plusকে into করা হয়েছে।

"এ তো গুণের চিহ্ন! তবে তোমার গুণের কোনো চিহ্ন কিনা বলতে পারি না।" আমি বল্লাম: "একে তো ঢেঁড়া সই বলে।"

তারপর একটা কাগজে 'শ্রীপার্থ' লিখে ওকে দেখালাম—"এই হচ্ছে তোমার নাম। ঠিক এইরকম করে লেখো তো দেখি।"

দেখে ও চম্‌কে উঠল। কাগজখানা ওর কোলে ফেলে দিলাম। লাঠির চোট্ বাঁচাতে গিয়ে মানুষ যেমন করে হাত তোলে ও ঠিক

তেমনি করে কাগজখানা সামলালো! তবে হয়ত ওটা ওর নমস্কারের ভঙ্গী—তাও হতে পারে।

"আস্তে আস্তে দুরস্ত করবে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তোমার সুবিধামত, ইচ্ছেমত, অবকাশমত একটু একটু করলেই হবে। যদ্দিনে পারো, এই সইটা করে আনো, কেবল এই তোমার পড়া রইলো, কেমন? আর এ নিয়ে বেশি ভেবো না—শয়নে স্বপনে ভাববার মতো এমন কিছু নয়—স্বপ্নে তো নয়ই। বুঝেছ?"

পার্থ ঢোঁক্ গিলল। তারপর কাগজখানাকে গুটিসুটি পাকিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলে গেল সে।

এক সপ্তাহ বাদে সে এল—পড়া তৈরি করে একেবারে। দেখলাম 'শ্রীপার্থ' সে নিখুঁত করে লিখেছে—আমার হস্তাক্ষরেই যদিও—তাহলেও ঠিক যেমনটি লিখে দিয়েছিলাম—অবিকল। তাছাড়াও তার খাতার আগাপাশতলা পার্থময় দেখা গেল—সব পাতাভর্তি শুধু শ্রীপার্থ! নামের এই বহর দেখে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না—নাম-মাহাত্ম্য যাবে কোথায়?

"আমার নামটা ইংরেজিতে সই করে দিন্ না। আমি পড়বো।"

য়্যাঁ? বলে কি? পার্থর পড়ায় মন? ওর এই অপার্থিব লালসায় আমার উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তক্ষুনি ওকে নতুন পড়া দিয়ে দিলাম।

এবার তিনদিনে রপ্ত করে পার্থ হাজির! দুখানা পাতা জোড়া ওর নামাবলি এক গাল হাসির সঙ্গে খুলে দেখালো।

এর পর থেকে 'মুর্গি ডিম পাড়ে', 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'কারো পকেট কাটা ভালো না', এই সব বড় বড় কথা ওকে লিখতে দেয়া

হোলো—এবং দেখা গেল ঠিক ঠিক সে লিখে এনেছে—এক চুল এদিক ওদিক হয় নি। বাহাত্তুর পার্থ!

পার্থর উন্নতির খবর পেয়ে জনশিক্ষা সমিতির সভাপতি সাধুবাদ জানিয়ে আমাকে এক চিঠি লিখেছিলেন—চিঠিখানা সগর্বে ওর চোখের ওপর মেলে ধরলাম।—"দেখচ! কী লিখেছেন উনি?"

পার্থ দেখল। দেখে বল্ল, "এর লেখাগুলো আপনার মত গোটা গোটা নয়। কেমন ইকরি মিকরি।"

"বাঃ! ইংরেজিতে লিখেছেন যে! দেখচ না।"

পার্থ চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিল—বেশ সাগ্রহেই। —"আচ্ছা এই চিঠিখানা আমি পড়ব এবার? দেখি পারি কি না।"

"পারবে। খুব পারবে। পৃথিবীতে না পারবার মতো কিছু নেই। সমস্তই গাছের ফল—টুপ করে পড়বার অপেক্ষায়। ফলাও হয়ে হাতের নাগালে ধরে রয়েছে—ধরে পাড়লেই হোলো।" আমি উৎসাহ দি।



পুলিশের অবশ্য-ধর্ত্তব্যের মধ্যে

তারপর আর অনেকদিন ওর পাত্তা নেই। চিঠিখানা পড়া (কিম্বা পাড়া) ওর পক্ষে

সহজ ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই ভয়েই কি সে পাড়া ছাড়ল নাকি?

অবশেষে একমাস বাদে, না, পার্থ নয়। তার খবর এল। কোনো এক ব্যাঙ্কে সভাপতি মশায়ের সই জাল করে সপ্তম বার টাকা তুলতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে।

সভাপতি মশাই মুখ অন্ধকার করে আমার কাছে এলেন—"এই তোমার কাজ? জনশিক্ষার নামে দুর্জনশিক্ষা চালানো হচ্ছে? পাড়ার সবাইকে জালিয়াতি করতে শেখাচ্ছো? বটে? তোমাকেও পুলিশের ধরা উচিত। তুমিও পুলিশের অবশ্য-ধর্তব্যের মধ্যে। ধরে কি না দেখা যাক্।"...শুনলাম, কিন্তু কিচ্ছু বল্লাম না।

কিন্তু পার্থ বল্ল। আমার কাছ থেকেই তার শিক্ষালাভ, সে কথা সে অকাতরে ব্যক্ত করল। কোনো কথাই সে অস্বীকার করল না। ওর পাঠ্য পুস্তক—সভাপতির স্বাক্ষরিত সেই চিঠিখানাও সে থানায় দাখিল করেছে। আর বলেছে, "আমি লিখতে জানি না। একদম্ না। তবে কেউ কিছু লিখে দিক্—" বলতে নাকি তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, শোনা গেল—"আমি তার ঠিক ঠিক নকল করে দেব।"

এবং তার এই কবুলতির তলায় সে নিজের নাম সই করেছে—টেঁড়া দিয়ে।...সেটা আমাদের গুণের চিহ্ন—তার আমার গুণপণা।



ধার ঘেঁসার ভারী ফেসাদ



পৃথিবীর অনেক কিছুই সার বলে' মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা অসার, ঠিক সারমেয়র মতন। নির্জন আড্ডাঘরের এককোণে আরাম-চেয়ারে এলায়িত হয়ে সবেমাত্র বিশ্বসংসার বিস্মৃত হতে চলেছি, চোখের পাতা বুজেছি, কি বুজিনি, এমন সময়ে ভূঁইফোড় দৈত্যের ন্যায় দীপেন আমার সামনে প্রত্যক্ষ হোলো।

"বনস্পতিকে দেখেছ?" খোঁজ করল সে—একটু খাপ্‌ছাড়া-ভাবেই।

"নাঃ। চারধার সাফ্‌। কোনো শঙ্কা নেই।" আমি তাকে অভয় দিলাম।

"এসেছিল কি আসেনি?" দীপেন তথাপি নাছোড়।

"আমি তাকে চোখেও দেখিনি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।" আমি জানালাম।

দীপেন বসে পড়ল। "তাহলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।" বল্ল সে: "অন্তত একবারটির জন্যও সে এখানে আসবে। গল্প করবার জন্যও অন্তত! রোজই তো আসে—না কি?"

আমি একদৃষ্টে দীপেনের দিকে তাকাই। "তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে?" আরাম চেয়ারের আওতায় যাও বা একটু ঘুম্‌ঘুম্‌ এসেছিল ওর কথার ঝট্‌কায় সে আমেজ কেটে যায়—ষোলো আনা সজাগ হয়ে উঠি: "য়্যাঁ? তুমি কার খোঁজ করেছিলে বল্লে? বনস্পতির না?"

"হ্যাঁ।" গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়ল। "বনস্পতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরি দরকার।"

আমি ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হই। ওর কথার মর্ম আমার মর্মে ঢোকে না, আমার নিরেট মাথায় ঠেকে ঠেকে ধাক্কা খায়। সত্যি বলতে, ওর কথার কোনো অর্থ হয় বলে' আমার মনে হয় না।

"তুমি দেখা করতে চাও—বনস্পতির সঙ্গে? এই কথাই বল্লে না?" আমি ওর বিবৃতির ছিন্নসূত্রগুলি আমার মানসপটে পরের পর সাজাই। শ্রুতি আর স্মৃতি আর সেই সূত্রদের জোড়াতাড়া দিয়ে পরম্পরায় সাজিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বার করার চেষ্টা করি। রহস্যটা পরিষ্কার করতে চাই।—"তুমি ওর দেখা পেতে চাও, সত্যি বলছো?"

"ঠিক যে চাই তা নয়—" দীপেন শুদ্ধিপত্র সংযোগ করে: "তবে তার সঙ্গে দেখা না করলেই আমার নয়।"

"কেন?" স্পষ্টবাক্যে আমি জানতে চাই।—"হেতু?"

"বল্‌লে পরে বুঝবে।" দীপেন বল্লে: "কদিন আগে গোটা পঁচিশেক টাকার আমার দরকার পড়েছিল হঠাৎ। অর্থোপায়ের মানসে এই আড্ডায় এলাম। বন্ধুবৎসল কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই যদি। কিন্তু বনস্পতি ছাড়া তখন আর কেউ এখানে ছিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই আমায় হাতড়াতে হোলো।"

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা। সেকালের বীরকেশরীদের যেমন হরিণ-শিকার করে' স্ফূর্ত্তি হোতো, দীপেনের তেমনি এই ঋণ-স্বীকার। এক রকমের মৃগয়াই বই কি।

এবং এই মৃগয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশ্বমেধ। দীপেনের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়।—"পরশুদিন শনিবার ছিল বুঝি?" আমি না জিজ্ঞেস করে পারি না।

দীপেন তানা-নানা করে। পরশুর শনিত্বকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়, করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু কাজটা নিতান্তই ক্যালেণ্ডার-বিরুদ্ধ বলে' তেমন সুষ্ঠুরূপে পারে না।

"কি রকম? কিছু সুবিধে হোলো মাঠে?" আমার পুনরপি প্রশ্ন।

মৃগয়ার টাকাগুলো গয়ায় গেল কিনা আমার জ্ঞাতব্য। দীপেন কিন্তু এ-জেরাটাকেও এড়াতে চায়—"ও কথা আর বোলো না।"

সে কথা বলবার নয় তা জানি। দীপেন যে-ঘোড়াকে ধর্তব্যের বাইরে জ্ঞান করে সেই ঘোড়াই হাসতে হাসতে জিতে যায়, যাদের বাজে মনে করে তারা হেঁটে গেলেও বাজি মারে, আর দীপেন যাদের ওপর বাজি ধরে তারা চার পা মায় লেজ তুলে দৌড়েও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমন কি, চতুর্থও হয় না—শেষ পর্যন্ত সেই 'অল্‌সো র‍্যান্‌' হয়ে দাঁড়ায়। মুখেই কেবল 'অল্‌সো র‍্যান্‌', আসলে তাদের রান্‌ করা তো নয়, শুধু হয়রাণ করা, দীপেনের মতো হতভাগ্যদের নাজেহাল করা নাহক্‌। নির্ঘাৎ জেতার বাজিও যে কি করে' ডিগ্‌বাজি খায় সে এক রহস্য—দীপেনের কাছে এবং আমাদের কাছেও। অতএব কথাটা অকথ্যই বাস্তবিক—ভেবে দেখলে!

এই অকথ্যতার জন্য কতোবার ওকে আমরা বলেছি, দীপেন, টাকাগুলো ঘোড়ার পশ্চাতে এভাবে অপব্যয় না করে' আর কোথাও ওড়াও। আমাদের কথা বলছিনে—তবে মেয়েদের পেছনে ওড়ালেও তো পারো! দীপেনের জবাব, চেনা মেয়েরা নাকি ওড়াবার বা উড়বার মতো নয়, তাদের জন্য খরচান্ত হওয়া পোষায় না। আমি বলি, নাহয় অচেনা অর্দ্ধচেনাদের জন্যেই করলে, ঘোড়ারাও তোমার কিছু পরিচিত নয় তো? মনের মতো মেয়ে নাই বা পেলে, দেখতে পরির মতো হলেই তো হয়। তখনই দেখবে—পূর্বজন্মের পরিচয়! প্রথম দর্শনেই টের পাবে। পুনঃ পুনঃ ঘনিষ্ঠতায় আরো বেশি করে' মালুম হবে। তাছাড়া, ঘোড়াদের জন্যে তুমি বহুৎ করেছ কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পেয়েছ কি?—ওর এক-চতুর্থাংশও যদি মেয়েদের যজ্ঞে দিতে

যোগ্য ফল পেতেই। ঘোড়াদের কাছ থেকে তুমি কোনো সদ্ব্যবহার লাভ করোনি—এত টাকা ঢেলেও এতদিনে ওদের একটাকেও উইন্-প্লেস্ কোথাও পাওনি, কিন্তু মেয়েদের বেলা তার অন্যথা দেখতে। নেহাৎ তাকে উইন্ করতে না পারো (তোমার বরাত!) তবে প্লেসে তাকে পেতে নিশ্চয়। সিনেমায় কি রেস্তরাঁয় সে না এসে যেত না। তারপর তোমার হাতযশ! হৃদয় যদি নাই পাও, এমন নির্দয়তা পেতে না।

এর জবাবে দীপেন মুখখানা যেন কিরকম করেছে। বিষাক্ত পৃথিবীতে বিষণ্ণ প্রতিভারা যেমন করে' থাকে। সামান্য মানুষরা না বুঝলে বা একান্তই ভুল বুঝে দোষ করলে মহাপুরুষদের যেমন করা দস্তুর। কিম্বা হয়তো,—শেলীকে আমি কখনো চোখে দেখিনি,—শেলীর মতই মুখখানা করেছে হয়ত। সেই দৃশ্য শেলের মত আমাদের বক্ষস্থলে বেজেছে।

তার ভাবখানা ভাষান্তরে এই দাঁড়ায়ঃ বৎসগণ, তোমরা পাঁড় বেকুব! দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? অশ্বতৃষ্ণা কি অন্য সুধায় মেটবার?…আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অশ্বাহত দীপেনের দিকে তাকাতে পারিনি। ঘোড়ার চাট্ ঘোড়াতেই সইতে পারে। আর —আর পারে দীপেন। ও আমাদের কম্মো না।

তবে দীপেনের চাট্ মাঝে মধ্যে যে আমাদের সইতে হয় না তা নয়। একদিনের কথা বলি। আমার নিজের কথা। মনে আছে এখনো। বর্ষাকাল, কোনো এক রাস্তার মোড়, টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। এক মাসিক পত্রিকায় গল্প বেচে কর্‌করে দশটি মুদ্রা নিয়ে ফিরছি—প্রথম লেখকজীবনের দশম দশায় ওই সম্বল! এমন সময়ে দীপেন এসে পাকড়ালোঃ "ভাই ভারী বিপদ, গোটা দশেক

টাকা আমায় দিতে পারো? ধার চাচ্ছি।" ওর চোখমুখ উদাস, চুল উসকু খুসকু, বৈরাগ্যের চেহারা।

"পাঁচ টাকা দিতে পারি।" আমি বল্লাম। এবং দুখানা নোটের থেকে একজনকে ছাড়িয়ে এনে দীপেনের হাতে সমর্পণ করলাম।



'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—'

দীপেন নোটখানাকে আল্‌গোছে নিয়ে পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে' তার মধ্যে রাখল। অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল। বৈরাগ্যবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—সন্দেহ কি? কিন্তু খলতার এই দৃষ্টান্ত দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেছে: "য়্যাঁ, য়্যাতো টাকা? তোমার আবার টাকার দরকার?"

"বাঃ, কাল শনিবার না? জানো না বুঝি?" সে জবাব দিয়েছে।

তখনো শনিবারের রহস্য, আরো অনেক রহস্যের মত আমার অজানা। হিউম্যান্ রেস্ আর হর্স্‌রেসের মাঝখানে দীপেন যে একটা মস্ত যোগসূত্র সেকথা পরে অবশ্যি জেনেছিলাম।

জেনেছিলাম পুরাকালীন অশ্বমেধের আধুনিক সংস্করণ কী। সেকালের বীরত্বের বিশ্বব্যাপী পরাকাষ্ঠাদের মাঠময় একালীন রূপান্তর দেখতেও বাকী ছিল না। শনিবারের আগে দীপেনকে দেখেছি—দেদীপ্যমান—এবং শনিবারের পরেও দেখেছি—অশ্ববল্লী-

কষায় সেবনের পূর্বে ও পরে। কিন্তু পরে আর সেই আগের দীপেনকে দেখতে পাইনি। সেই দীপ্তি আর দেখা দেয় নি। তার বদলে আমার সম্মুখে ভাষান্তরিত (এবং ভাবান্তরিত) The Pain-কেই প্রকটিত হতে দেখা গেছে।

তার বেদনায় আমরা ব্যথিত ছিলাম না তা নয়। আমরা, বন্ধুবান্ধবরা, আমাদের সাধ্যমত তার অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে কুণ্ঠিত হই নি, কার্পণ্যও করি নি, কিন্তু দীপেন অশ্বমেধ করছে কি অশ্বরা দীপেনমেধ করছে, আমাদের পক্ষে তা ঠিক করা একটু কঠিনই ছিল বোধহয়। অবশেষে একালের অশ্বমেধকে আমার রাজসূয় বলেই ভ্রম হয়েছে—দীপেন তো ছার, এমন কি, রাজারাজড়াদেরও শুইয়ে দেয়, এমনি ব্যাপার!

দীপেনকে শোয়ানোর একটা গল্প শুনেছিলাম। দীপেনের কাছ থেকেই। এক শনিবার ঘোড়াদের নিকটে বিড়ম্বনা লাভ করে' মাঠের দুঃখ ঘাটে ভুলবার সে মনস্থ করল—সটান্ লেকে গিয়ে জলাঞ্জলি যাবে এই বাসনা। কিন্তু জলপথ তো ঐ একটি নয়—দুঃখ ভোলানোর আরো অনেক জলপ্রণালী আছে। রকমফের করে' দুঃখ টুখ্‌খ্ ভুলে'—ভুল্‌তে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ীর পথও দীর্ঘতর আর টলটলায়মান হয়েছে দীপেনের কাছে। অগত্যা করে কী? কোথায় শোয়? পাহারোলার হাতে না পড়ে রাতটা কাটায় কি করে'? হঠাৎ সামনে ঘোড়াদের একটা জলাধার দেখতে পেয়ে এবং নির্জলা দেখে তার মধ্যেই কুঁকড়ে সুঁকড়ে কোনোরকমে সেঁধিয়ে গেছে।

তারপরে যে-ঘটনার কথা সে বলে, সেটা স্বপ্ন বলেই আমার মনে হয়। অনেক ভালো ভালো গল্প পড়তে পড়তে শেষটায় স্বপ্ন হয়ে

যায় দেখা গেছে। দীপেনের উক্তিতে, অনেক রাত্রে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর কয়েকটা ঘোড়া সেখানে নাকি জল খেতে এসেছিল। ঘোড়াই বটে, কিন্তু গাড়ী টানতে টানতে আধা গাধা বনে গেছে এম্‌নি চেহারা! তাকে সেখানে দেখে তারা যা আশ্চর্য হোলো তা বলবার নয়। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, "দেখেচ এই লোকটার দশা? চিন্‌তে পারছ একে? আমরা যখন টালীগঞ্জের মাঠে দৌড়াতাম তখন এই লোকটা আমাদের কতই না উৎসাহ দিয়েছে! নাম ধরে ধরে কতো না আমাদের ডাকা ডাকি! হায়, আবার যে আমাদের এই ভাবে পুনর্মিলন হবে কে জানত? অদৃষ্টের পরিহাস দেখ! আজকে আমরা এই ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে বাঁধা, আর সেই লোকটা কিনা এইখানে!"


দীপেনের Nightmare

দীপেন বলে, "দেখেচ, ঘোড়ারা কখনো ভোলে না। হারিয়ে দেয়, হারিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখে। মেয়েদের চেয়ে ঢের ভালো।"

কিন্তু আমার ধারণায়, ও দুটি ঘোড়া নয়, রাত্রের ওঁরা। অশ্ব-জাতীয়াই হয়তো—তবে অন্যরূপা, দীপেনের নাইট্‌মেয়ার্।

"তা, হাতড়ে পেলে কিছু—? বনস্পতির ট্যাঁক্ থেকে?"

"পেলাম।" অধোবদনে বল্‌ল দীপেন: "তিনটে বাজতেদশ মিনিট তখন চেয়েছিলাম, আর পাঁচটা বেজে কুড়ি, তখন পেলাম।"

"অনেক বল্‌তে হোলো বুঝি?"

"আমি? না, আমি না। আমাকে কিছু বল্‌তে হয়নি—ঐ টাকাটা একবার মুখ ফুটে চাওয়া ছাড়া"—দীপেন সকাতরে জানায়: "—একটা কথাও আমায় বল্‌তে হয়নি।"

"খুব বক্‌ল বুঝি? তোমার এই অশ্বরোগের জন্যেই বোধহয়?"

"বক্‌ল বলে' বক্‌ল। যেমন বকুনি তেমনি বুক্‌নি—তেমনি আবার বর্ণনা। তবে ঘোড়াটে'াড়ার ধার দিয়েই না। বনজঙ্গলের ব্যাপার সব।"

আমি বুঝতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতিরসিক। বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় সে মাতোয়ারা। গাছপালা ঝিল্‌জঙ্গল বন-বাদাড় তার অন্তরঙ্গ। এমন কি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মুখর। ওর বনস্পতি নামডাক তো এই জন্যেই।

পরের বনকে সে নিজের মত মনে করে। অবশ্যি, সেরকম ধারণা অনেকের থাকে, তারা প্রথম সুযোগেই সাত পাকে সেটাকে বদ্ধমূল করে একেবারে নিজস্ব করে' নেয়—তারপরে আর তারা বোন থেকে বোনান্তরে ধাওয়া করে না। কিন্তু এত বনে এত পাক মেরেও আজও ওর বন্য লালসা গেল না। এখনও ও অন্য বনের—আরও পরবর্তী বনের স্বপ্ন দ্যাখে। ওকে শোনা মানেই বনমর্মর শোনা।

"তোমায় এখানে একলাটি পেয়ে খুব বুঝি বলে' নিল? ওর সব বন্য-অভিযানকাহিনীই বুঝি—?"

"শুধুই কি বন্য অভিযান? কতো কী। বনের লাবণ্য পর্যন্ত।

আর বল্ল বলে' বল্ল। সে কী কথা—আর কথার কী তোড় রে বাবা! যেমন করে' তুবড়ি কাটে তেম্‌নি যেন কথারা তার ভেতর থেকে ছিট্‌কে বেরুতে লাগল। চাওয়ামাত্র এক কথাতেই টাকাটা দিতে রাজি হয়েছিল বলে' শেষ পর্যন্ত সব আমায় সইতে হয়েছে।"

বেচারার প্রতি আমার মায়া হয়। আমি বুঝতে পারি।··· বনস্পতির প্রাকৃতিক রস কিছু কিছু আমাকেও চাখতে হয়েছে। ওর অনেক গাছপালা, আমার ভেতর শেকড় গাড়তে না পারলেও, তাদের শাখা-প্রশাখা আমার নাককানের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে দ্বিধা করেনি। স্বভাবতঃই দীপেনের প্রতি আমার সহানুভূতি না হয়ে পারে না। এমন কি, কবেকার আমার সেই পাঁচ টাকার শোকও আজ আমি ভুলতে পারি।

আমি বলি, "আহা!" এবং আরো বলি: "তাহলে তো ঐ পঁচিশ টাকা তুমি উপার্জন করেছ বল্‌তে হবে। কায়ক্লেশেই উপার্জন করেছ। কানের ক্লেশে বালকেরা বিদ্যা অর্জন করে, তুমি অর্থ উপায় করলে। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কান দিয়েছ—তোমার কানের কি একটা দাম নেই? তার বদ্‌লি এটা তোমার ন্যায্য পাওনা। হাতের খাটুনির চেয়ে কানের খাটুনি কিছু কম নয়—তার দ্বারাও কাজ দেয়া যায়। সেই কাজ দিয়ে তার বিনিময়ে ঐ টাকা তোমার ওই রোজকার রোজগার।"

"কাজ? কেবল কাজ? এমন কষ্টকর কাজ আমি জীবনে করিনি। পঁচিশ টাকা উপায় করতে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা কখনো আমার পোহাতে হয়নি। এর বদলে খনির গর্ভে সেঁধিয়ে কয়লা কেটে আনতে হলেও আমার ঢের বেশি আরাম ছিল।" দীপেনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

"তাহলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আরো আশ্চর্য লাগে।

বিস্ময়ের বিষয় বাস্তবিক্। অশ্বমেধের জন্যই ওর গর্দভমেধ হলেও, দীপেন এক গাধাকে দুবার বধ করে না। পাত্ররা জবাব দেয় বলে' নয়, একবারের জব্দকে দুবার জবাই করতে কোথায় যেন ওর বাধে। চক্ষুলজ্জাতেই কি না কে জানে! একবার ধার করলে আর সে ধার মাড়ানো ওর স্বভাব নয়। পারৎপক্ষে তাকে ভুলে যাওয়াই ওর অভ্যেস। এক হিসেবে সেটা ভালো—হতভাগ্যদেরও ভুলতে সময় দেওয়া হয়। সময়ের মত শোকঘ্ন কী আছে? তাছাড়া, গাধাও তো অগাধ!

এক এক সময়ে আমি ভেবেছি যে, ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌সোওলারাই মরে' বুঝি দীপেন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচার করে' দেখেছি—না, তাতো না। তাদের বারম্বার—দীপেনের একবার; তাদের একজনকেই পুনঃ পুনঃ; দীপেনের প্রত্যেক জনকে একান্তে; তাদের হোলো স্যাঁক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্—আর ওর কামারসুলভ এক ঘা। বিবেচনা করলে দুজনের টেক্‌নিক্—নেবার কায়দা স্বতন্ত্র। একজনের ক্ষত রেখে যাওয়া, আরেকজনের খতম্ করা। আসলে ওদের ধর্ম্মই আলাদা—ট্যাক্‌সো-ওলাদের অর্থকামের নিবৃত্তি নেই, কিন্তু দীপেনের একেবারে মোক্ষম্।

তবে কি ও স্বভাব বদ্‌লেছে? আগের শিকারকে পরে স্বীকার করা, একবারের বলির প্রতি আরেকবার বলিষ্ঠ হওয়া কোনোদিন ওর কুষ্ঠিতে ছিল না—ওর চরিত্রের সেই কুষ্ঠব্যাধি কি তাহলে সেরে গেল? তা না হলে বনস্পতিকে ও আবার খোঁজে কেন?

"মানে, কাল বুঝি আবার শনিবার? তাই না?"···আমি জানতে চাই: "না, তাই বা কি করে' হয়? পরশুদিনই তো একটা

শনিবার গেল। নয়কি?—" এবার আমার অবাক্ লাগে। বারটা যতই বাঞ্ছনীয় হোক্, এত ঘন ঘন আসবার তো নয়। জীবনে এবং রেস্‌কোর্সে বারম্বার এলেও, সপ্তাহে সেই একটি বারই তার আসা। তাহলে এখনই আবার বনস্পতিকে ফের কেন?—

দীপেন ঘাড় হেঁট করে' থাকে। কোনো উচ্চবাচ্য করে না। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে হলে স্বভাবতঃই যে সঙ্কোচ সকলের হয়ে থাকে তারই প্রতিচ্ছায়া যেন ওর মুখে দেখি। আমি বুঝতে পারি। "মানে, আর কারো কাছ থেকে কিছু বাগাতে পারোনি বুঝি? তাই এমন করে' দাবানলে ঝাঁপ দিতে—জ্বলন্ত বানপ্রস্থে যেতে প্রস্তুত হয়েছ? আহা, আমিই তো তোমায় দিতে পারতাম—" বলেই ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য নিজের মনে নিজের কান মলে' দিই—"কিন্তু এম্‌নি হয়েছে ভাই, দুঃখের কথা কী বল্‌ব! ক'দিন থেকে টাকাকড়ির মুখ একদম্ দেখতে পাচ্ছিনে—"

"সত্যি কথা শোনো।" বাধা দিয়ে দীপেন বলে: "টাকাটা ওকে আমি ফেরৎ দিতে এসেছি।"

"য়্যাঁ-া-া-া-া-া—?" আমি চম্‌কে উঠি। দীপেন এসেছে পরিশোধ করতে। পরীদের থেকে নিলেও যে পরিশোধ করে না, সে এসেছে পরের টাকার প্রতিদান দিতে। তার এই অযাচিত অপ্রত্যাশিত আগমনী—Ripley'র Believe it or not-এর replay বলেই আমার মনে হতে থাকে। ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?

"সত্যি, টাকাটা আমি ওকে ফিরিয়েই দেব।" দীপেনকে মরিয়া বলে' মনে হয়।

"তাহলে মণিঅর্ডার করে' পাঠিয়ে দিলেই তো পারো। তোমার

কানের মায়াতেই আমি বল্‌ছিলাম”—আমি বাৎলাই: “সেইটাই কি ভালো হোতো না? ভালো এবং নিরাপদ?”

“উঁহু, তার চেয়েও ভালো পন্থা আমি পেয়েছি।” দীপেন উদ্দীপ্ত।

“বটে?” আমি তাকাই ওর মুখে।

“ভেবে ছাখো,” দীপেন ব্যক্ত করে: “ও আমার কাছে পঁচিশ টাকার ঢের বেশী পায়। সমস্ত আমি সুদে আসলে শোধ করব—একেবারে কড়ায় গণ্ডায়। বনজঙ্গলের বিষয়ে আমার বেশি জানা নেই, তবে বাঁহাত্তরটা গোপাল ভাঁড়ের কেচ্ছা আমি মুখস্থ করে' এসেছি। সমস্ত বনস্পতিকে শোনাব। তার ওপরে আমার ছোট ছেলেটা—সবে তার কথা ফুটেছে—সারাদিন ধরে যা যা বলে আমার স্মৃতিপটে গাঁথা হয়ে থাকে। সেই সব আবোল-তাবোলও ওকে শুন্‌তে হবে। তারপর এই ছাখো—” পকেট থেকে বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা বার করে দীপেন—“এর থেকে একটার পর একটা সমস্ত শব্দরূপ আমি আউড়ে যাব।”

শব্দরূপের সামনে বনস্পতির জব্দ রূপ আমি মনশ্চক্ষে দেখি। আমার মনে হয় ওই যথেষ্ট। দীপেন কিন্তু সেখানেও থামে না।

“—তারপরে এই ছাখো।” বলে' আরেক পকেট থেকে আরেক গ্রন্থ সে বার করে: “এই ছাখো তিপ্পান্নটা স্ন্যাপ্‌শট্‌। সারা জীবন ধরে' যত জায়গায় আমি ঘুরেছি তার নিদর্শন! এইগুলি একে একে ওকে দেখতে হবে। আর এদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যত ভূগোল আর ইতিহাস জড়িত রয়েছে তার সব বৃত্তান্তও শুনতে হবে ওকে। বাঁহাত্তরটা গোপাল ভাঁড়, তার ওপরে এই তিপ্পান্নটা ছবি—কেমন হবে?” দীপেনের চোখে মুখে জিঘাংসার ছবি।

"যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। মন্দ হবে না।" আমার উৎসাহ জাগে।—"এরই নাম প্রতিশোধ—যাকে বলে, কড়ায় গণ্ডায়।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দ্বারপথে বনস্পতির ছায়া দেখা গেল। আমরা চোখ তুলে তাকালাম, বনস্পতিই বটে।

"মাভৈঃ!" দীপেনের কানে কানে অভয় দান করে' আস্তে আস্তে সেখান থেকে আমি সরে পড়লাম। কায়দা করে' বনস্পতির পাশ কাটিয়ে—ওর বনদের মায়াপাশ এড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

দু'ঘণ্টা বাদে আড্ডায় উঁকি মারতে গিয়ে দেখি, দীপেন নিঃঝুম মেরে আছে। আছে কি নেই বোঝাই যায় না। চেয়ারে বেবাক্ পর্য্যবসিত হয়ে রয়েছে কিন্তু বনস্পতির চিহ্ন নেই কোথ্থাও।

"কী? কদ্দূর? কিরকম শোধ নিলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মানে, শোধ দিলে, সেই কথাই বল্‌ছি।"



হাতী দয়ে পড়লে কিরূপ হয় কখনো দেখিনি। কিন্তু দীপেনের কিম্ভূত কিমাকার থেকে তার কিছুটা আঁচ পেলাম। ঘাড় তুলে পাগলের মত চোখে ও তাকালো।

"না ভাই।" গোঙাতে গোঙাতে ও বল্ল: "দিতে পারিনি। বল্‌ব কি, তার নোট পাঁচখানা ফেরৎ দেবার পর্য্যন্ত ফুরসৎ পেলাম না।"

শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়



"মাস্টারি? মাস্টারির কথা বলছ? মাস্টারির কথা আর বোলো না।" আমি বল্লাম আমার বন্ধুকে।

এখনো আমি ইস্কুলের স্বপ্ন দেখি, সে কথা সত্যি। বই বগলে পড়তে যাচ্ছি, বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে আছি, খাতাকলমে এগ্‌জামিন দিচ্ছি, মাস্টারের হাতে কানমলা খেতে হচ্ছে—এসব দৃশ্য দেখি এখনো। এবং এসব আমার কাছে সুখস্বপ্ন।

কিন্তু—কিন্তু মাস্টারির স্বপ্ন আমি কখনো দেখি না।

মাস্টারি কদাচ করিনি যে তা নয়। একবার করতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য, বকলমে যদিও। কিন্তু তার স্মৃতি আমার কাছে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।...শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে কি কারো ভালো লাগে? কেউ বলুক।

"বেশ ভালো বেতন ছিলো কিন্তু।" অনুরোধের উপর উপরোধ।

"যতো টাকাই দিক্, প্রাণ থাকৃতে আর না।" আমি শিউরে উঠি।

"দশ বছর মাস্টারি করলে গাধা হয়ে যায় বলে। সেই ভয়েই বুঝি—?" বন্ধুর মধ্যে বন্ধুরতা দেখা দেয়।

"গাধা হয় কিনা জানিনে, তবে ছাত্র হয়ে যেতে হয়—সত্যিই। আমাকে তো দশ দিনেই ছাত্রত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল,—কিন্তু সেজন্যে নয়।"

"এর আগে মাস্টারি করেছিলে বুঝি কখনো?" বন্ধু বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ, করতে হয়েছিল। একবার, এক জনের একটিনি। আমার জীবনে সেই প্রথম আর সেই শেষ।"

"কিন্তু শিক্ষাদান তো মহৎ ব্রত।" বন্ধু তথাপি ছাড়েন না।

"তা জানি। কিন্তু শিক্ষা দিতে গিয়ে যা বিব্রত হতে হয়! সহজ নয় শিক্ষা দেয়া, সে কথাও আমার জানা আছে। শিক্ষা দিতে গিয়ে উল্‌টে শিক্ষা পেয়ে আস্‌তে হয়। আর সত্যি বল্‌তে, শিক্ষালাভ করতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। আমার ছেলেবেলার থেকেই।"

"সেই কারণেই তুমি বনেদী শিক্ষক হতে পারতে। শিক্ষালাভে যাদের অরুচি তারাই তো শেখায়। তোমার বনেদ্ বেশ পাকা ছিল হে!" বন্ধু বল্ল: "তোমার আপত্তির কারণটা শুন্‌তে ইচ্ছে হয়। কী হয়েছিল মাস্টারি করতে গিয়ে জান্‌তে পারি?"

"সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী। শুন্‌বে নিতান্তই?—তাহলে শোনো।....

"আমার এক বন্ধু ছিলেন ইস্কুলমাস্টার। অসুখে পড়ে আমাকে তাঁর বদ্‌লি দিয়ে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। অসুখের মধ্যেও এতটুকু সুখ মাস্টারদের সয় না—তাদের অদেষ্টই এম্‌নি। এম্‌নি সাবু তাকে দিতে পারো, কিন্তু তার সঙ্গে যদি একটু মিছরি মিশিয়ে দাও তাহলেই তার হয়ে গেছে। সেই মিছরিটুকুই তার কাল হবে।

ছুটি বলে' মাস্টারদের কিছু নেই। দশটা পাঁচটা ইস্কুল তো আছেই—তার ওপরে এবেলা ওবেলা টিউশানি। সকাল সন্ধ্যে—সমান ছুটোছুটি। বিকেলেও বাদ নেই। ভ্যাকেশনেও ছুটি নাস্তি। রেহাই কে দেয়? মরবার আগে মাস্টারদের ছুটি হয় না। এমন কি, ছুটি পেলেই তারা মারা পড়ে। আমার বন্ধুটিও বোধহয় এই কারণেই দিন দশেক ছুটি উপভোগ করতে না করতেই আমার মাস্টারি

পাকা করে দিয়ে ইহলোক এবং এই ইস্কুলের যতো বালকের মায়া কাটালেন।

মাস্টারি পাকা হলে কি হবে, মাস্টারির ব্যাপারে আমি নেহাৎ কাঁচা ছিলাম। পাকা মাস্টার যে কখনো দেখিনি তা নয়,—পঠদ্দশায় দেখেছি, শিক্ষকদশাতেও দেখলাম। সেই ইস্কুলেই দেখা গেল—বেশ পাকা পাকা শিক্ষক। অনেক ভালো ভালো লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন—একেবারে ঘুণ! একথা আমি জানি। তবুও আমি যে তাঁদের পাকচক্র কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি সেজন্যে আল্লাকে ধন্যবাদ!

কেবল মাস্টাররাই নন্, পড়ুয়াদেরও বেশ পাকা পাকা বল্‌তে হবে। এই দোরোখা পরিপক্কতার প্যাঁচে পড়ে যে অভিজ্ঞতা—যে অমানুষিক অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি তা কহতব্য না—তুমি কি নিতান্তই শুন্‌তে চাও?—

নেহাৎ না শোনালে না যদি ছাড়ো তো শোনো। আমার কিন্তু সে দুঃখ-কাহিনী কাউকে বলার উৎসাহ হয় না। জানো তো, ইস্কুলের আমার যা বিদ্যে তাতে ভালো ছাত্র কোনোদিন আমায় বলা চল্‌ত না, তবু তারই দৌলতে মাস্টারিটা বোধহয় ভালোই চালিয়ে নেব, এইরূপ আমার ধারণা ছিল। বিদ্যার বহর তো ছেলেরাই বয়ে মরে; আমাদের শুধু হেট্ হেট্ বল্লেই হয়। এবং তারা তো বইয়ের ভারে হেঁট হয়েই রয়েছে। এই হেতু ছাত্র হওয়ার পক্ষে যা কিছুই নয়, শিক্ষক হওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট, এমনকি, গুরুতরও বলা যায়। ছোটরা তো বড়োদের পড়া ধরতে পারে না—এই এক মস্ত সুবিধে। অতএব কাজটা পাকাপাকি হতেই কোমর বেঁধে লেগে গেলাম।

বলেছি তো, পড়ুয়ারা বেশ পাকাপোক্ত। অনেকেরই দাড়িগোঁফ বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ ফের বয়সে আমার বড়। অনেকে আবার ছেলের বাবা। অমন চক্ষু বিস্ফারিত কোরো না, ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এক যুগ আগের কথাই বল্‌ছি। তখন কারো কারো সৌভাগ্যে বাল্যশিক্ষা ও বাল্যবিবাহ এক সঙ্গে স্বুরু হোতো—ষোলো বছরে পা দেবার পর। চাণক্যের উপদেশমত, পাঁচ বছর পর্যন্ত আছুরে থেকে, দশ বছর বাপ মা খুড়ো জ্যাঠার তাড়না সহ্য করে' ষোলো বছরে একেবারে পাঁঠা বনে' পঠদ্দশালাভ। বই এবং বউ—ছুরকম পাঠ্যই একসঙ্গে—সিস্‌টেম্‌টা কিছু মন্দ ছিল না। যাই হোক, আমার একটু মুস্কিল হোলো, ওরা আমায় মান্‌বে কি, উল্‌টে আমারই ওদের মান্য করে' সমীহ করে' চলতে হোতো।

তবু চালিয়ে নিয়েছিলাম। আমি লেখক বলে আমাকে ওঁরা বাঙলার মাস্টার করে দিয়েছিলেন। লেখক হওয়া সত্ত্বেও, যতগুলো বাঙলা বানান আমার নির্ভুল জানা ছিল, ওদের পড়াতে পড়াতে প্রায় তার সবই আমি ভুলে গেলাম। এক-একটা শব্দের যে কতদূর সম্ভাবনা আছে, কতগুলো বানান হতে পারে, তা এগ্‌জামিনের খাতা না দেখলে জানা যায় না। এক পৃথিবী বানানই আমি আট রকমের দেখেছি —প্রত্যেক ছেলের মাথাতেই পৃথিবী বানাবার স্বতন্ত্র আইডিয়া। তুমি যদি পৃথিবীর বানান ফট্‌ করে আমায় জিজ্ঞেস কর, আমি চট্‌ করে হয়ত বলতে পারব না। আদি যুগের সেই মাস্টারির কৃপায় আমার ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

তবু, এত বোঝা বওয়াও আমার পক্ষে ভারী ছিল না, বোঝাতেও বেশ পারতুম, কিন্তু মুস্কিল বাধলো বুঝতে না পারায়। সেটা আমার

দিক থেকেও বটে, ওদের দিক থেকেও বটে। উভয়তই এই মিস্-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা ঘটলো, এবং ঘটতে লাগলো ক্রমান্বয়ে। খাঁচার পাখী আর বনের পাখীর মধ্যে যেমনটা খোঁচাখুঁচি নাকি একদা ঘটেছিল। দুজনে কেহ কারে বোঝাতে নাহি পারে, সমস্ত বোঝার ওপরে খচিত হয়ে এই শাকের আঁটিটাই সব চেয়ে বেশি বিড়ম্বনা হয়ে উঠল—উটের পিঠের মারাত্মক শেষ কুটোটির মতন তেম্নি শোকাবহ।

কর্মধারয় জিনিসটা কী, ওদের প্রশ্নের জবাবে একদিন আমি বোঝাচ্ছিলাম। বলছিলাম যে ওটা যা তা কথা নয়, গীতার কথা। কথাটা কর্মধারয় নয়, কর্মের ধারা। তবে সংস্কৃত করে বহুবচনে কর্মধারয় হয়তো বলা যায়—আমি ঠিক বলতে পারব না,—তোমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কোরো। আসল কথা হচ্ছে, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই বলে আঙুল নেড়ে গীতার সমূহ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, ওরা একযোগে ঘাড় নাড়তে সুরু করল।

"তা নয় সার্।" সকলের মুখে এক বাক্য।

"তাহলে ধার করাই যাদের কর্ম তারাই হচ্ছে কর্মধারয়—"

"তা নয় সার্।" ভদ্র বালকদের সেই এক কথা।

"তা নয়, তবে কী?" জিজ্ঞেস না করে পারি না।

তবে যে কী তার উত্তর না দিয়ে, বোধহয় আরও বেশি ওয়াকিবহাল হবার উদ্দেশ্যেই ওদের একজন প্রশ্ন করে বসলো—"তাহলে দ্বন্দ্বটা কী, বলুন তো।"

"দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব হচ্ছে খুব খারাপ।" আমি বললাম। একটুও গোপন করলাম না।—"এবং সর্বদা দেখবে দ্বিধার সঙ্গে জড়ানো থাকে। কথায় বলে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কখনো শোনোনি?"

কখনো যে শুনেছে ওদের হাবভাবে এরূপ আমার মনে হোলো না। ওরা বল্লে, দ্বন্দ্ব একটা সমাস।

আশ্চর্য নয়। এই ধরণের কথাটা আমিও যেন কোথায় শুনেছিলাম। কোথায় আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। দ্বন্দ্ব যে কেবল সমস্যা নয়, সমাস হওয়াও সম্ভব, আমার মনের কোথায় যেন এ-সন্দেহটা বদ্ধমূল ছিল—নাড়া পেতেই সেখান থেকে সাড়া এলো। কিন্তু তাহলেও, হাজার কৌতূহল হলেও সমাসটা যে কী, সে কথা তো আর ওদের কাছ থেকে জেনে নেয়া যায় না!

"আচ্ছা, তদ্ধিতটা কি সার্?" সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে আবার এক ষাঁড়াশী আক্রমণ।

"বোধহয় আরেকটা সমাস?"

"উঁহু। তদ্ধিত হচ্ছে প্রত্যয়।" তারা বল্লে। একযোগে আর সমস্বরে।

অবশ্যি, তারা বল্লেই যে আমাকে প্রত্যয় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু আমি আর কথা না বাড়িয়ে, এর ওপর ফের বহুব্রীহি আর ষষ্ঠীতৎপুরুষ—সেরকম ঝামেলা আসতে পারে কেমন যেন আমার আশঙ্কা হচ্ছিল—তার আগেই ক্লাস থেকে উঠে এলাম। এসে সটান্ বাড়ি ফিরে ব্যাকরণ নিয়ে পড়লাম। ইস্কুলের অতো বছরে যার তিন পাতাও



তদ্ধিত-প্রত্যয়!

সারতে পারিনি, তার আগাগোড়া এক নিশ্বাসে আর এক রাত্রে সারা করলাম।

কিন্তু ভেবে ছাখো, এত হাঙ্গামা করে' ছেলে পড়ানো পোষায় না। আজ ব্যাকরণ, কাল টেক্‌স্‌ট্‌, পরশু মানের বই, তার ওপরে অভিধান, এইসব পড়ে—পড়ে পড়ে আর মুখস্থ করে' প্রত্যহ যদি ওগ্‌লাতে হয়, তাহলে ফের কেঁচে গণ্ডুস করে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেই পারি—মাস্টার হয়ে আবার পড়াতে যাওয়া কোন্ তুঃখে ?

তাছাড়া, কেবল ইস্কুলেই নয়, ইস্কুলের বাইরেও বেশ ঝক্কি ! রাস্তায় ঘাটে পথে বিপথে কলকাতার অলিতে গলিতে আমার ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানেই যাই, যেদিকেই পা বাড়াই, কেউ না কেউ সাম্‌নে এসে পড়ছে—আর 'নমস্কার সার্' শুন্‌তে হচ্ছে আমায়। হয়তো এক জায়গায় স্থির হয়ে একটু আলুকাব্‌লি খাচ্ছি, অম্‌নি একজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো : 'নমস্কার সার্।'

ভদ্রতার খাতিরে—যদিও শিক্ষক-ছাত্রের ভেতরে ভদ্রতার সম্পর্ক ঠিক নয়—তাহলেও আমার ভাগ থেকে একটু দিতেই হয়। "চাখ্‌বে নাকি ? নাও একটু।"

আলুকাবলি খাওয়া যে অতি গর্হিত এবং খেলে পেট কামড়ায়, ছেলেটার ভাবখানা যেন এই রকম। তবু নেহাৎ আমি সাধছি, আর আমি নাকি গুরুজন আর গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই, সেই জন্যেই যেন বাধ্য হয়ে একটু হাত পেতে নেওয়া। এবং তার পরেই আমাকে চীনেবাদাম কিন্‌তে সে উদ্বুদ্ধ করে—"ওগুলোও খেতে বেশ সার্।"

আরে, তাকি আর আমি জানিনে ? চীনেদের চেনবার আগে

থেকে আমি চীনে বাদাম চিনেছি, চিবুতে চিবুতে বলে কি, বুড়ো হয়ে গেলাম! তবে কিনা ছেলেটি চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম—এইমাত্র। কিন্তু গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ যে এতদূর অচ্ছেদ্য হতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল?

এইভাবে কি সিনেমায় কি রেস্তরাঁয় কি হেদোর ঘাটে আর কি ফুটবলের মাঠে ছাত্রদের সাথে টক্কর খেয়ে খেয়ে আরো আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। বারম্বার নমস্কার সার শুনতে হলে মানুষের সারভাগ আর কতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে? ওদের সারাংশের মর্যাদা রাখতে আমায় জীবন আর পকেট দুই অসার হয়ে উঠল। কী-ই বা বেতন পেতাম, তার ওপর ওদের খাইয়ে আর সিনেমা দেখিয়েই ফতুর হবার দশা হোলো। আর কী চেনাটাই ওরা আমায় চিনেছিল। আমি ওদের অনেক সময়ে চিন্‌তে না পারলেও ওরা আমায় ঠিক চিনে নিত—কি করে' পারত জানিনে। আমি মোটে দুটি ক্লাসে পড়ালেও, গোটা ইস্কুলটাই যেন আমার ছাত্র হয়ে গেছল। এবং তারা বোধহয় কেউ বাড়ীতে বসে সময় নষ্ট করত না। ঠিক যে আমার অপেক্ষায় পথে পথে ওৎ পেতে থাকৃত তা অবশ্যি আমি বল্‌তে চাইনে, তবু রাস্তাটাই যেন ওদের একমাত্র আস্তানা, এক এক সময়ে এমন সন্দেহ আমার না হোতো যে তা নয়।

বেশি কি বলব, এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র ওদের ভয়েই এতটা বয়স পর্যন্ত চরিত্র-স্খলনের আমি সুযোগ পেলাম না। আমাকে সচ্চরিত্র থেকে যেতে হোলো অনিচ্ছাসত্ত্বে—এক রকম বাধ্য হয়েই। ইচ্ছে থাকলেও উচিত পথে পা বাড়াবার কোনোদিন আমার সাহস হোলো না। কি জানি, সেদিকেও যদি কারো গায়ে ধাক্কা লাগে

আর অম্‌নি সে করযোড়ে বলে' ওঠে, নমস্কার সার্‌, তাহলেই তো হয়েছে ! এবং আমার প্রাক্তন ছাত্ররা কলকাতার কোথায় নেই বলুন ? যদিও তাদের অনেকেই এখন মাষ্টার কিম্বা অধ্যাপক কিম্বা কালোবাজারী হয়ে গেছে তাহলেও আমার তো ছাত্রই ! আর আমি তাদের চিন্‌তে না পারলেও,—এখন তো চিনে ওঠা আরো কঠিন,—তারা আমায় ঠিক চিনে রেখেচে। তাদের হাতে নিস্তার নেই।

বার্নাড শ বলেছেন, যারা কোকেন্‌ খায় নি আর ইদিকে সিদিকে এক-আধটু গতিবিধি-করে নি, তারা নাকি এযুগের নাগরিক রূপে গণ্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুল করে' কবে একবার মাস্টারি করেছিলাম বলে' কোক্‌শাস্ত্র আর কামশাস্ত্র উভয়ই এ জীবনে আমার অজানা থেকে গেল। মোক্ষলাভ আমার হোলো না। ভয় হয় আবার হয়ত আমায় জন্মাতে হবে। সাধ রয়ে গেল, কিন্তু স্বাদ রইলো না—এই জন্যেই,—কিন্তু উপায় নেই, বেশ বুঝতে পারছি।

আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বন্ধু বলেন—"কেন, কোকেন তুমি এখনো খেতে পারো। সে সুযোগ তোমার যায় নি। লজ্জা করলে, বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে খেয়ো, কেউ টের পাবে না।"

"হ্যাঁ, ঐ সম্ভাবনাটাই এখনো আছে। তবে জানো কি বন্ধু, অর্ধেক মনুষ্যত্বে—আধখানা মানুষ হয়ে লাভ নেই। উপনিষদ্‌ বলেছেন, নাল্পে সুখমস্তি।" ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি উপস্থিত করি।

"দুঃখের কথা থাক্‌। তোমার মাস্টারির কথা বলো।"

"তাইতো বল্‌ছি। তবু, ছেলেদের নিয়ে কেটে যাচ্ছিল কোনো রকমে আলুকাবলি চীনেবাদাম ফুটবল মাঠের অকস্মাৎ-দর্শনী পেয়ে পেয়ে আমার ব্যাকরণ-জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো দিন তারা বিদ্রোহ

ঘোষণা করেনি, ইস্কুলের হাই কম্যাণ্ডের কাছেও কিছু বলে নি, আমার বিপক্ষে তাদের কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না। অন্যান্য শিক্ষককে তারা যেমন নাস্তানাবুদ করত বলে' শোনা যেত, আমাকে কখনো সেরূপ বিপাকে ফ্যালে নি। বরং আমাকে তারা একটু যেন স্নেহের চক্ষেই দেখত, এখন আমার মনে হয়।

তবু মাষ্টারিটা আমার টিকলো না। মেয়েদের শত্রু যেমন পুরুষরা নয়, মেয়েরাই আসলে—তেমনি ছাত্ররা নয়, মাস্টাররাই হচ্ছে মাস্টারের দুষ্‌মন্‌। জনৈক মাস্টারের জন্যই মাস্টারিটা আমায় ছেড়ে দিতে হোলো শেষ পর্যন্ত।”

“হেডমাষ্টার বুঝি?” জিজ্ঞেস করল বন্ধু।—“একদিন ক্লাসে এসে তোমার পড়ানোর পরীক্ষা নিতেই তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি সব টের পেয়ে গেলেন? ধরা পড়ে গেল শেষটায়?”

“না, সেরূপ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। হেডমাষ্টার অতি উপাদেয় ছিলেন—অমন লোক হয় না। বলতে কি, সব ক'টি মাষ্টারই খাসা, কেবল একজন বাদে। ভদ্রলোকের নাম এখন আমার মনে নেই। তাঁকে আমরা গড়গড়ি বলতাম।

গড়গড়ি ছিলেন সেকেণ্ড মাষ্টার। প্রৌঢ় মানুষ, হেডমাষ্টারের চেয়েও বয়সে ভারী। বিল্‌কুল্‌ সেকেলে লোক। কি রকমের যেন! কিছুতেই তাঁকে একটাও কথা আমি কওয়াতে পারিনি। কিছুতেই না।”

“লাজুক প্রকৃতির বোধহয়?”

“আমিও তাই ভাবতুম। বল্‌তে কি, লোকটা আমার বেশ ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরকম অমিশুক লোক আমি জীবনে

দেখিনি। মাষ্টারদের বস্‌বার ঘরে তাঁর টেবিলে তাঁর মুখোমুখিই আমায় বস্‌তে হোতো। আর এমন খারাপ লাগতো আমার! মিনিটের পর মিনিট্ কেটে যাচ্ছে অথচ কারো একটা কথা নেই।

আমি কথা বলবার কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বৃথাই, গড়গড়ি একদম্ স্পীক্‌টিনট। গায়ে পড়ে ভাব করতে গেছি, কিন্তু গড়গড়ি গায়েই মাখে না। আমলই দেন না আমায়। উচ্চবাচ্য করা দূরে থাক্, নমস্কার কর্‌লে প্রতিনমস্কার পর্যন্ত জানায় না। এমন দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য ব্যক্তি জগতে অতি বিরল।

অবশেষে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। নিজমনে বল্লাম, আর আমার গড়াগড়ি দিয়ে কাজ নেই, গড়গড়ি, তোমায় আমি গড় করি! তুমিও যদি চুপচাপ থাকো ত আমিও চুপচাপ। তোমার সঙ্গে কথা না বললে যে আমার ভাত হজম হবে না তা নয়। কেউ সেধে কথা বলবার জন্যে মাথার দিব্যিও দেয়নি আমায়।"

"অজান্তে হয়তো গড়গড়ির কোমল প্রাণে তুমি ব্যথা দিয়ে থাক্‌বে কখনো?" বন্ধু আন্দাজ করেন।

"আমারও তাই মনে হোতো। কি করে' তা হতে পারে তাই আমি ভাবতুম। কিন্তু ভেবেও যেমন কূল পাইনি, ভালো করে' ভাববার সময়ও ছিল না। একে তো সকালে উঠেই ইস্কুলের পড়া করতে হোতো—"

"ইস্কুলের পড়া?" বন্ধুর চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে ওঠে।

"বাঃ, ইস্কুলের পড়া করতে হবে না? পড়ানো কি চাট্টিখানি নাকি? আমাকে আবার দুদিনের পড়া সারতে হোতো—যে পড়া কাল দিয়েছি আর যা কালকের জন্য দেব—দুদিক বজায় রাখতে

হোতো আমায়। আর সে পড়া কি কম? ব্যাকরণ, অভিধান, মানের বই—সব মুখস্থ—একেবারে জিহ্বাগ্রে।"

"মনে থাক্‌তো সব?"

"থাক্‌লে তো বাঁচতাম। ছোটবেলায় পড়া ফাঁকি দেবার জন্য এক এক সময়ে দুঃখ হোতো, কিন্তু না দিলেই বা কি, এতদিনে ভুলে মেরে দিতাম ঠিক! মস্তিষ্ক তো আমার কোনোদিনই বর্ধমান নয়, বরং চব্বিশ পরগণা। মেমরি স্টেশনই সেখানে নেই। তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করতাম—যতটা পারি। তারপর, হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম। পড়াশুনা সেরে, নেয়ে টেয়ে, নাকে মুখে গুঁজে ইস্কুলে পৌঁছতে প্রায়ই লেট হয়ে যেত। বিশ্রাম-ঘরে আমার বসবার জায়গায় গিয়ে হাঁপ ছাড়বার আগেই দেখতাম গড়গড়ি নিজের ক্লাসে চলে গেছেন। তারপর তিনি এসে চেয়ারে বস্‌তে না বস্‌তেই আমার ক্লাস। কেবল টিফিনের সময়টুকু যা আমরা একটু মুখোমুখি হতাম। কিন্তু এর মধ্যে কখন্ যে আমি ওঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারি আমি তো ভেবে পেতাম না। যাই হোক্, এইভাবে মুখ ভার করে' তো দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন কালো মেঘের ধার ঘেঁষে রূপালী পাড় দেখা দিলো।"

"গড়গড়ি হাস্‌ল?"

"হ্যাঁ। হাস্‌লই বলা যায়। মাস দেড়েক তখন আমার মাস্টারি চল্‌ছে। সেদিনও লেট হয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটছি, ইস্কুলের মোড়ের কাছটায় পৌঁছে দেখি, গড়গড়ি দাঁড়িয়ে। প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে, কোনো তাড়া নেই। আমাকে দেখে তিনি একটু হাসলেন। সে-হাসিতে বন্ধুবাৎসল্য কিম্বা অপত্যস্নেহ কি প্রকাশ পেয়েছিল আমি জানি না।

তাঁর হাসি দেখে নিজের তাড়ার জন্য আমার লজ্জা হোলো। আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনো আমার ধারণা হয়নি যে, আমার জন্যই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ছাত্ররা যেমন কলকাতার সর্বত্র মোড়ে মোড়ে মরীয়া হয়ে অপেক্ষা করে, তাঁরও প্রায় সেই দশা দাঁড়িয়েছে তখনো আমি ধরতে পারিনি।

কেবল হাসিই নয়, কুশলপ্রশ্ন আবার!—'এই যে, শরীর বেশ ভালো?'—গড়গড়ির মুখ থেকে শুনতে হোলো আমায় স্বকর্ণে। আর কী স্নেহবিগলিত স্বর! আমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথা, তবু কি করে' জানি না, খাড়া রইলাম।

"লোকটা লাজুক প্রকৃতির ছিল আমার মনে হয়।" টিপ্পনি কাটল বন্ধু: "লজ্জার বাঁধ ভাঙতেই এতদিন লাগলো তার।"

"আমারো তাই মনে হোলো তখন। আমি মনে মনে বল্লাম—আমার এতদিনের ধারণা তাহলে ভুল। ভদ্রলোক সত্যিই সদাশয়, কেবল লজ্জার বাধাতেই এতদিন মুখ খুলতে পারেননি। আজ এতদিন বাদে আমাকে একান্তে বিরলে পেয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। তারপর কুশল প্রশ্ন সেরে যখন তিনি আমার গলা জড়িয়ে ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলেন, তখন আমার বিস্ময় কোন্ চূড়ান্তে গিয়ে ঠেকেছে তুমি আঁচ করতে পারবে।"

গড়গড়ি স্নেহভরে আমাকে টেনে নিয়ে বলতে বলতে চল্লেন—"একটা কথা তোমাকে বলব ভায়া—কিছু যদি না মনে করো—"

গড়গড়ি কথা বলছে—আমার সঙ্গে? গড়গড় করে' বলছে—অবাধে এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে—নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পারলেও কথাগুলো কানের কাছেই গড়াতে লাগলো।

"না না, কী মনে করব! মনে করাকরির কী আছে?" আমি গদ্‌গদ হয়ে গেলাম: "কিচ্ছু আমি মনে করিনি। ভেবে দেখলে আপনি এই ইস্কুলে বহুদিন রয়েছেন, আপনি একজন প্রবীণ শিক্ষক। আর আমি হালের আম্‌দানি। আপনার সঙ্গে আমার ঠিক সমান তালের সম্পর্ক তো নয়। তা আমি বুঝতে না পারি তা নয়। এবং সেই কারণেই আমি কোনোদিন কিছু মনে করিনি। আপনিও কিছু মনে করবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

"না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু মনে করিনি—" গড়গড়ি বল্লেন।

"হ্যাঁ, তাই। তাই বল্‌ছিলাম। ও নিয়ে কিছু মনে করবার নেই। তারপর, আজ যখন আমাদের ভাব হয়ে গেল, হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হোলো, তখন আজ থেকে সেকথা অতীতের কথা। আপনিও সে কথা ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।"

এই বলে আমিও গড়-গড়িকে—এক হাতে যতদূর নেয়া যায়—জড়িয়ে ধরলাম। তবে আমার আলিঙ্গন তেমন জোরালো হোলো না, বলাই বাহুল্য।



গড়গড়ি-জর্জরতা

মোড় থেকে ইস্কুল কাছেই। কাজেই জড়াজড়ি করে' যাবার বেশি পথ এবং ফুরসৎ ছিল না। তাছাড়া, জর্জরিত হয়ে গড়গড়িকে

যেন একটু বিমনা দেখা গেল। কেমন যেন তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন।"

"অবার সেই পুরনো লজ্জা দেখা দিল বুঝি?" জিজ্ঞেস করল বন্ধু।

"না, ঠিক ব্রীড়াবনত নয়, তবু কেমন যেন সঙ্কুচিত। আমার দিক থেকে এতখানি উৎসাহে একটু যেন হক্‌চকানো। ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের অবস্থা আর কি! যাই হোক, আমরা পায়ে পায়ে ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলাম। ওদিকের গির্জার ঘড়িতে এগারোটা তখন বেজে গেছে। আমিই বক্‌তে বক্‌তে চলেছি—গড়গড়ির মুখে কোনো কথা নেই।"

"তোমার বিহ্বলতায় বোধহয় বোবা মেরে গেছেন?" বন্ধু মন্তব্য করেন।

"আমারো তাই মনে হোলো। ভাবের গোড়াতেই এতটা ভাবাতিশয্য হয়ত ভালো হয়নি, আমি ভাবলাম। ঐটুকু পথ আর আমাদের কোনো কথোপকথন হোলো না: কেবল আমি কথা কইলাম আর উনি আমার জবাবে দুএকবার হুঁ হাঁ করলেন মাত্র। তারপর ইস্কুলের গেটে পা দিয়েই তিনি ধাঁ করে ফিরে দাঁড়ালেন—গির্জার ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার।

"ঐ যাঃ! লেট্ হয়ে গেল আজ্‌কে।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন গড়গড়ি: "আজ পঁচিশ বছর এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছি, একদিনের জন্যও আমার লেট্ হয়নি।"

"বলেন কি মশাই?" আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম: "এতো দস্তুরমতো একটা রেকর্ড। আমি তো এই মাস দেড়েক মাত্র

কাজ করছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমার অন্তত দিন দশেক লেট্ হয়ে গেছে।" বলতে কি, আমার রেকর্ডটাকে একটু খাটো করেই বল্‌তে হোলো।

আমাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিদান করে' এবং নিজেও বিমুক্ত হয়ে তাঁর হাতটা আমার কাঁধে তিনি রাখলেন,—"আমি তা জানি। এবং ......এবং এই কথাটাই—"

আম্‌তা আম্‌তা করে তিনি বল্লেন অবশেষে: "এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই তোমাকে আমি বল্‌তে চাইছিলাম।"



মহা পাকিস্থানের পথে।



'চল্‌তি ট্রামে কদাপি উঠো না।'—আধুনিক দশবিধ অনুশাসনের একটি। উক্ত বিধান উল্লম্ফন করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে গলা ভাঙবে, সে আর বেশি কি!

এইতো সেদিন, নিখিল ভারতীয় নির্বাচনের কিছু পূর্বে। নতুন হাওড়া পুলের ওপর দিয়ে গঙ্গার শোভা দেখতে-দেখতে চলেছি। পদব্রজেই।

পুল পেরিয়ে ট্রাম্‌খানাকে প্রায় হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠেছি। ব্রজলীলার পরেই আমার সেই Rush লীলা!

ট্রাম্‌-বোঝাই মানুষ, তবু ওরই মধ্যে গুতো-গুঁতি করে' বসা গেল। ট্রাম্‌যাত্রা আর জীবনযাত্রা—দুই আজকাল কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হয়। গা'সওয়া হয়ে গেছে।

অবশ্যি, হাওড়া পুলের কাছ থেকে চোরবাগান এমন কিছু দূর ছিল না, কিন্তু ট্রাম্‌ পেয়ে গেলে কে আবার পায়ে হাঁটে? অন্ততঃ, তারপরে হাঁটবার আর তেমন জোর পাওয়া যায় না। ওজোরও থাকে না।

বড়বাজারের সম্মুখে এসে পড়তেই গাড়ীশুদ্ধ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে। চীৎকারের গোড়ার দিকটা ঠিক বোঝা গেল না, তবে ব্যাপারটা বেশ নাড়া দেওয়া। লড়ায়ের তদ্‌বিরের মতো।

তাহলেও, ওর শেষাংশ আমার অশ্রুতপূর্ব নয়। চীৎকার-শেষটা হচ্ছে, "...আল্লা হো আক্‌বর!"

আমার জানা কথা। খিলাফৎওয়ালা প্রথম অসহযোগের মুখে ভলান্টিয়াররূপে নিজেই কতো চেঁচিয়েছি!

চুপ করে' আল্লার নামগান শুনছিলাম, হঠাৎ সামনের একজন আমাকে লক্ষ্য করল—

"কী হে! তুমি চেঁচাচ্ছো না যে?"

"আমি! আমি আবার কী চেঁচাবো?"

"বাহ্! জান্ কবুল করেছো, নিজের জান্ দেবে, আর আওয়াজ দিতে পারবে না? সে কী?"

ওর কথায়, ওর মতো অনেকেই কটমট্ করে' আমার দিকে তাকালো।

কখন্ জান্ কবুল করলাম তা ঠিক মনে না পড়লেও, জান্ নিয়ে যে নগ্‌দাই টান পড়তে পারে, তা জানাবার লোকের অভাব যে সেই ট্রামে নেই, তখনই মালুম হোলো।

"কী বল্‌তে হবে?" সঙ্কুচিত হয়ে বল্লাম।

"আমরা যা বল্‌ছি তুমিও তাই বল্‌বে।" আমার পাশের ছেলেটি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

তারপর আমাদের মধ্যে (ক্রমাগত প্ররোচনায়) এই ধরণের বলাবলি হতে লাগল:

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

"আমরা চাই—"

"পাকিস্থান।"

একদল প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করছে; অপর দলের কেবল

পাকিস্থান-ধ্বনি। কি করে' যে ওরা নিজেদের মধ্যে এরূপ শ্রমবিভাগ করেছিল, সে রহস্য আমার অজানা। এবং অজানা বলেই পদে পদে আমার গোল বাধছিল। ওদের 'আমরা চাই' শুনে আমিও বল্‌তে যাচ্ছিলাম—"আমরা চাই—" কিন্তু তখন আর সবাই আমরা চাই ছেড়ে দিয়ে পাকিস্থান নিয়ে পড়েছে।

যাই হোক্‌, এইভাবে বাক্যালাপ চলছে, এমন সময়ে "উহুঁ হুঁ, তুমি আবার চাইছো কেন?—" আমার পাশের ছেলেটি বাধা দিয়ে বল্লে।

"আমরা সবাই মিলে না চাইলে কি পাকিস্থান হবে?" আমি জানাতে চাই।

"তুমি শুধু বলো 'পাকিস্থান'—তাহলেই হবে।" ওরা অতো জনে মিলে চাইছে, ওর মতে, তাই না কি যথেষ্ট।

অগত্যা, জিনিষটা ঠিক হচ্ছে না, নিখুঁত তো নয়ই, মনে-প্রাণে জেনেও ওর কথামতো আমি কেবল পাকিস্থানের তাল সামলাতে লাগলাম।

যন্ত্র-চালিতের মত আর সব মন্ত্রোচ্চারকের সঙ্গে তাল দিচ্ছি। সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে পাক খেয়ে চলেছি—পাকিস্থান··· পাকিস্থান···পাকিস্থান···

গলায় গলায় গলাগলি, এমন সময়ে শুনলাম, সারা ট্রামের সুর বদ্‌লেছে। পূর্ববক্তারাই উল্‌টে পাকিস্থান আওড়াতে সুরু করেছেন, উত্তর-ভারতীরা কী উতোর গাইছেন বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ এরকমের উল্‌টো পাকে আমার তো বিপাক। তবু, ভদ্রলোকের এক কথা। আমি পাকিস্থানকেই আঁকড়ে রইলাম।

(যার জন্য জান্ কবুল করেছি তাকে প্রাণপণে পাকড়ে থাকা এমন কিছু শক্ত নয়।)

"এই, তুমি পাকিস্থান বল্‌ছো কেন হে? পাকিস্থান তো আমরা বল্‌ছি।" আমার সামনের আওয়াজদার আমাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, "পাকিস্থানের উপর পাকিস্থান—সে আবার কি?"

তাও তো বটে, সত্যি! পাকিস্থানের উপরে পাকিস্থান—বিপ্লবের উপর উপবিপ্লব কখনই সমর্থনযোগ্য না। আমি বল্লাম: "আমি তাহলে কী বল্‌বো?"

"তোমার দলের সবাই কী বল্‌ছে শুন্‌ছো না? তাই বলো।"

ভালো করে' কান পাতলাম এবার। পাশের ছেলেটি আমার কাছে ফাঁস করলো—"তুমি বলো জিন্নাবাদ।"

চল্লো আরেক ধারার আর্ত্তনাদ:

এবার ওরা: "পাকিস্থান—"

আর আমরা: "জিন্নাবাদ!"

ওরা: "পাকিস্থান—"

আমরা: "জিন্নাবাদ!"

ধারাবাহিক চালানো। বল্‌তে কি, এই ধরণের বাদানুবাদে এতক্ষণে আমার বেশ উৎসাহ জাগছিল। এতগুলো ধারালো কণ্ঠের জিন্নাবাদে সত্যিই রোমাঞ্চ হয়। জয়োল্লাস ভারী ছোঁয়াচে।

জিন্নাবাদ, বাস্তবিক্! আমাদের কায়দে-আজাম কাল আমাকে যা বেকায়দায় ফেলেছিলেন—

এই কালকেই তো আরেক পাকিস্থানি ধাক্কায় পড়েছিলাম।

সালুনে কামাতে গেছি। ষণ্ডামার্কা একজন লোক কামাচ্ছিল আমায়।

আধখানা গাল কামিয়ে গলার কাছাকাছি এসে—কামাতে কামাতেই—হঠাৎ সে জিগেস করে' বস্‌ল: "পাকিস্থান সম্বন্ধে আপনার কী মত ?"

"তোমারো যা আমারো তাই।" বল্লাম—অম্লানবদনে।

"আমার কী মত—আপনি জান্‌লেন কি করে' ?"

তাকে যেন একটু অবাক্ দেখা যায়।

"জানিনে, তা ঠিক।" আমি জবাব দিলাম: "কিন্তু ক্ষুরটা যে তোমার হাতে এটা তো জানি।"

অদ্ভুত সেই সালুন্‌ওয়ালা—দাড়ি এবং পাকিস্থান এক ক্ষুরে কামাচ্ছে। দুটি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুগপৎ লড়াই—ধন্য বটে!

মনে মনে সেই সালুনওয়াকে সাবাস্ দিচ্ছি আর মুখে মুখে আউড়ে চলেছি, হঠাৎ আমার খট্‌কা লাগ্‌লো, সে কি, পাকিস্থান থেকে জিন্না বাদ কি রকম ? পাকিস্থান তো জিন্না সাহেবেরই আবাদ। তাঁরই চাষ-করা আম্‌দানি, এই তো জানি। তাহলে তাঁর নিজস্ব থেকে তিনি বর্‌বাদ্ কেন ?

আমার সমস্যাটা পাশের ছেলেটির কানে ফিস্ ফিস্ করতেই—

"জিন্নাবাদ কেন ? জিন্দাবাদ তো।" সে ফোঁস্ করে উঠেচে। রীতিমত বিরক্ত হয়েই—বল্‌তে কি!

তাই নাকি ? তাহলে তো আমি বেশ করছিলাম! এতক্ষণ ধরে জিন্নাসাহেবকেই বাদ দিচ্ছিলাম! অবশ্যি, আমার দোষ ছিল না। আমাদের গান্ধীবাদ থেকে যেমন গান্ধিজী বাদ, খৃষ্ট ধর্ম্মে যেমন খৃষ্টানি

আছে কিন্তু খৃষ্ট নেই, খাজা সার নাৎসিমুদ্দিন যেমন খাজা নন্, নাৎসি নন্, (এবং অসার নন্), ফজ্‌লুল হক্ যেমন নিতান্তই নাহক্, তেম্‌নি জিন্নাবাদ থেকে জিন্নাসাহেবের বাদ যাওয়াটা কিছু বিস্ময়কর ছিল না। মহাপুরুষরা প্রবাদ হবার জন্যেই জন্মান্—কে না জানে? তবে কি না, অতো বাদ সাদেও তাঁদের যা বাকী থাকে—বাতিল হবার পরেও তাঁদের যে তিলমাত্রা—তার ঠ্যালাই কিছু কম নয়! তাতেই কুরুক্ষেত্র!

গলা ছড়াতে ছড়াতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে এসে পড়া গেল। আমার চোরবাগান এখান থেকেই শর্টকাট্। 'বাঁধকে বাঁধকে' বলে' ট্রাম্ থেকে নামতে যাচ্ছি, আমার সহযাত্রীদের থেকে বাধা পেলাম সট্‌কানোর পথে।

"এখানে কেন? এখানে নামছো যে?"

"এইখানেই তো!" বল্লাম আমি।

"না না। এখানে নয়। পার্ক-সার্কাস্। আমরা সবাই সেখানেই চলেছি তো।" পাশের ছেলেটি আমার পিরাণ ধরে টান মারে।

পরাণের চেয়েও পিরাণ আমার প্রিয়—এই বাজারে। সে-টান্ সামলাতে না পেরে আমি বসে পড়লাম।—"বহুৎ খানা আছে।" ছেলেটি আমার কানে কানে জানালো।

খানা আছে? খানার কথায় চাঙ্গা হয়ে উঠতে হোলো। সে কথা বল্‌তে হয়! তাহলে তো সার্কাস্ পর্যন্ত না যাওয়াই বোকামি। এতক্ষণ ধরে যা চেঁচিয়েছি তার কিছুটা উসুল হওয়া তো চাই। গলাটা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে, এখন খানা-জাতীয়-কিছু না সেখান দিয়ে গেলে জোড়া লাগবে বলে' মনে হয় না।

"আগে বল্‌তে হয়।" তাকে বল্লাম। বলেই "পাকিস্থান জিন্দাবাদ!" বলে জোরালো এক আওয়াজ ছাড়া গেল। ঘোষণাটা উদর থেকে উদিত হয়ে আগাপাশতলা ঠেলে আমার হৃদয়বিগলিত করে দোনলা গলা দিয়ে গলে এল, বল্‌তে কি!

চেঁচাতে চেঁচাতে পাকিস্থানে এসে পৌছালাম। পাকিস্থানের প্রায় সমস্তটাই পার্ক, মাঝখানে সার্কাস। পাকিস্থানীদের ভিড় মন্দ নয়। আমাদের দলটিও তার একধারে গিয়ে ভিড়ে গেছে।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়ে পড়লে যা হয়, ঠিক তেম্‌নি মিশ্‌ খেয়েছি। দুটি গোরু বা দুজন ইয়াঙ্কিকে যেমন আলাদা করা যায় না, বিভিন্ন চীনেম্যানকে যেমন পৃথক্‌রূপে চিনে রাখা দায়, তেমনি পাকিস্থানীদের মধ্যে আমার ভ্যাজাল—খাঁটি ঘিয়ের সঙ্গে সাপের চর্ব্বির মতো—অবলীলায় গলে মিশে গেছে। চেহারায় কিম্বা চালে আমাকে হিন্দুস্থানী বলে ধরে—কার চাচার সাধ্য! জিন্না সাহেব যে আমাদের স্বতন্ত্র দুটি জাতি বলে সন্দেহ করেন, তা মিথ্যে নয়। একেবারে পাকি ওজনের, তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই।

তবে এটা আমার চেহারার গুণও হতে পারে। হয়তো এই গুণের জন্যেই আমার রূপের অভাবটা হঠাৎ তেমন নজরে পড়ে না।

এই পেটেণ্ট চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা সব স্থানেই খাপ খায়—এমন কি, এই পাকিস্থানেও বেখাপ্‌পা নয়। হয়তো আমার এই কপিরাইট্‌-হীন প্যাটার্ণ টাই কারো সন্দিগ্ধ ভ্রূ-কুঞ্চন না হবার একমাত্র কারণ। অবশ্যি, নিজমুখের এই মোগলাই কারিকুরির পক্ষে আমার নিজের কোনো বাহাদুরি আছে আমি মনে করি না। আমার বংশগতও

কোনো কৃতিত্ব নেই। কেন না, আমার পূর্ব-চক্রবর্তীদের মধ্যে কেউ মোগল ছিলেন বলে আমার জানা নেই—এদিক থেকে বহুৎ পাকিস্থানীর সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল।

আদিম এবং অকৃত্রিম চক্রবর্তীদের আর্যাবর্তের বাসিন্দা বলেই আমি জানি। তাঁদের সেই আদিনিবাস থেকে সুদীর্ঘ পথ দেশকালক্রমে টক্কর খেতে খেতে অবশেষে সুতানুটিতে এসে পৌঁছোনো—একটানা দীর্ঘসূত্রীতার ইতিহাস। আর্যাবর্ত থেকে পূর্বপাকিস্থান—এতটা পথব্যাপী কার্যের আবর্ত কম ছিল না। পথে দাক্ষিণাত্যও পড়েছে, এবং আত্মায় দাক্ষিণ্য আর দেশে দেশে কলত্রাণি থাকলে যা হয়, আর্যাদের বর্তমানেও ভালো মানুষরা ভার্যার আবর্তে পড়তে পারেন। চলার আনন্দে, অপচয়ের অনুপাতের সঙ্গে পাল্লা রেখে সঞ্চয়ের বোঝা তাঁরা বাড়িয়ে গিয়েছেন—চলার ফুর্তির সাথে—যাকে বলে, ফুর্তির চাল। সমস্ত চালের মোট—সেই বোঝাই এখন আমাদের উত্তরাধিকার। ফলতঃ, এই সব কারণে, হেথায় আর্য হেথা অনার্য এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা যদি এক দেহে এসে লীন হয়ে থাকে এবং এই চেহারার মধ্যে মোগলাই আর পাটনাই, মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড়িয়, চেক্ এবং উজবেক, হট্টমালা আর হাওয়াই সবাই মিলে খাপ খেয়ে ঠিক খাপ্‌সুরৎ না হলেও কেমন যেন হনলুলুমার্কা হয়ে গেছে বলে যদিইবা মনে হয়, তার জন্য আর যেই হোক্, আমি নিশ্চয় দায়ী নই মশাই ?

এবং এ বিষয়ে যে পাকিস্থানীদের ঈর্ষা করব, তারও বিশেষ যো ছিল না। নাম গোত্রে বহু হলেও আকৃতিতে তাঁরা হুবহু—এবং আমায় সঙ্গে একাকার। অবশ্যি, তাঁরা আমাদের চেয়েও আরো

পশ্চিমের, খোদ্ আরব মুল্লুকের আম্‌দানি। (আরব্য-উপন্যাসে আমি অবিশ্বাস করিনে।) কিন্তু হলে কি হবে, এ দেশের জল-হাওয়ার এমনি গুণ, এখানে এলে কালের ঘূর্ণীপাকে সমস্তই জলাঞ্জলি—ঘুণ লেগে আসলটাই হাওয়া।

আশ্চর্যই বই কি! আমাদের সকলের চেহারায় এক ট্রেডমার্ক—তাকিয়ে দেখলে তাক্ লাগে। আগেকার দিনে ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না একথা যাঁরা বলেন, এবং এর পরেও হয়ত জোর করে' বল্‌বেন, তাঁদের মতবাদের আমরা যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। বেশ বোঝা যায়, আরব্যের থেকে রপ্তানির পর, এ দেশের নানান্ খপ্পরে পড়ে একই ধারায় রপ্ত হতে হতে অবশেষে তাঁরাও সেই একইরূপ পরাকাষ্ঠায় এসে পৌছেচেন। আসলে সেই এক রকমের পোড়াকাঠ।

দুটি স্বতন্ত্র নেশন্ হয়েও শেষ পর্যন্ত এই শোচনীয় একজাতীয়তা—উভয়ের এই এক কন্‌ডেম্‌নেশন, ভাবতে কষ্ট লাগে। এজন্য, এবং জনাব জিন্নার জন্য দুঃখ হয়, সত্যিই।

ভূগোল এবং ইতিহাসের কিরূপ বিজাতীয় চক্রান্ত, ভাবুন দিকি!

ইতিমধ্যে আবার সেই আগেকার সোরগোল শোনা গেল। সর্বাগ্রে ট্রামে শোনা নাড়া-চাড়া দেয়া সেই গগনভেদী আল্লাহো আকবর নিনাদ। আমার পার্শ্ববর্তী ছেলেটির কাছে জয়ধ্বনিটার পুরোপুরি ভাষ্য জানতে চাইলাম।

"নারায়ে তক্‌বির...আল্লাহো আকবর।" সে প্রকাশ করল।

"তক্‌বির নয়, তদ্‌বির।" আমি ওর ভ্রম সংশোধন করলাম: "তক্‌বির বলে' কোনো কথা নেই, যদ্দূর আমি জানি। তবে তদ্‌বির

হলেও হতে পারে, ও কথাটা আমার জানা। আমাকেও মাঝে মাঝে কতো রকমের তদ্‌বির করতে হয় তো।"

"তদ্‌বির নয়—তক্‌বির।" বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে বল্ল। আমার প্রুফ-কারেক্‌শন্‌ গ্রাহ্যই করল না।

"হতেই পারে না।" আমি বল্লাম: "বরং তক্‌দির বলো তো মানতে রাজি আছি। তক্‌দির মানে অদেষ্ট।...অদেষ্টই কি না...কে জানে!"

বড় গলা করে বল্লেও তবু আমার একটা প্রশ্ন থেকে যায়। "না—কি, তুমি বল্‌ছো তস্‌বির? তস্‌বির মানে ছবি।" একথাও আমি বলি।

"তক্‌দিরও্‌ না তস্‌বিরও না। নারায়ে তক্‌বির।" তার সেই এক কথা। (ভারী একগুঁয়ে ছেলে বল্‌তে আমি বাধ্য।)

"তক্‌বির্‌ মানে কী, শুনি তবে?" আমি জানতে চাই।

"তোমার মাথা।" তার জবাব আসে।

"জানো না, তাই বলো।" আমি বল্লাম: "আল্লাহো আকবর ভালো কথা। এবং তক্‌বিরও না হয় হোলো। তোমার কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু এত নাড়ানাড়ি কিসের জন্য, বলো দেখি?" আমার আরেক জিজ্ঞাস্য।

"তোমার মুণ্ডু।"

একটার পর একটা ট্রামগাড়ী আসছে—পাকিস্থানীতে ঠাস্‌ বোঝাই। এক একটা ট্রামের পুরোভাগে—ড্রাইভারের সাম্‌নের পাদানিতে পর্যন্ত পাকিস্থানীরা খাড়া—সেই নামমাত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা হাত পা ছুঁড়ছে—"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।..." একরোখা লড়ায়ের ধারাবাহিক আস্ফালন।

আমি লক্ষ্য করে' দেখলাম আগন্তুক ট্রাম্‌গুলির সম্মুখে কিছু নেই—কোনো জনমনিষ্যি না। মশা মাছি হয়ত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তারা আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টির বাইরে ছিল।

"লোকগুলো হাওয়ার সঙ্গে লড়ছে বলে' মনে হয়।" পাশের ছেলেটিকে বল্‌তে আমি বাধ্য হলাম।

"না লড়লে কি পাকিস্থান মিলবে? লড়তে তো হবেই আমাদের।" বল্‌তে গিয়ে ছেলেটির বুক ফুলে ওঠে।—"লড়েই তো নিতে হবে।"

"তাহলে তো ইংরেজের সঙ্গেই আমাদের লড়তে হয়। আগে পাক খুললে তার পরে তো পাকিস্থান। আগে দেশ স্বাধীন—"

"উজ্‌বুকের মতো বকছো কেন? তুমি কি পাকিস্থানের বাসিন্দা না? পাকিস্থানের জন্য জান্‌ কবুল্‌ করোনি?" ছেলেটি আমাকে তিরস্কার করে।

পাকিস্থানের জন্য জান্‌ কবুল করেছি কি করিনি আমি ভেবে দেখি। একবার যেন খিলাফতের জন্য করেছিলাম স্মরণ হয়—অসহযোগের সময় দু একবার এক আধ মাসের জেল খেটেছি। ভারত কিম্বা তুর্কী—কার জন্য এই কারাবরণ ঠিক না জানলেও, বন্দে মাতরমের সঙ্গে আল্লাহো আকবর ডাকতে ডাকতেই সেখানে যাওয়া গেছল মনে আছে।

তবে যদি আমি কোথাকার বাসিন্দা এই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সত্যি কথাই বল্‌তে হবে। পাকিস্থানেই আমি থাকি। চোরবাগানের কাছাকাছি যেখানটায় আমার আস্তানা সেটাকে পাকিস্থানই বলা উচিত। এমন কি, কাঁচিস্থানও হয়ত বলা যায়—বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না—তেমন চুল-চেরা করে' যদি দেখি: চোরবাগান এবং কলাবাগান

সমস্ত বিজাতীয়তা ভুলে যেখানে এসে মিলে মিশে এক হয়ে এই যুগের শ্রাবস্তি হয়ে উঠেছে। আমার আলাপী প্রায় সকলেরই সেখানে কাঁচির কাজ। পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অমন উদারতার কাজ আর হয় না। আমার দোস্তরা খুব জবর লোক হলেও কোনো জবরদস্তি নেই—কলাবাগানের বাগানোর কলাই মর্ত্য-মানের চূড়ান্ত। শিল্পের সাক্ষাৎ প্রয়াগধাম—প্রয়োগে নৈপুণ্য আছে, কিন্তু ধুমধাম নেই। খাঁটি আর্টিষ্টের একনিষ্ঠ তপঃ-সাধনা তাদের। কোনো আওয়াজ কুচকাওয়াজ নেই, কোনো লড়ালড়ি না। চুপ্ চাপ্ খুচ্ খাচ্—খুচরো কারবার—কাঁচির কাজ, কিন্তু কারুকাজ—মোটেই কাঁচা কাজ নয়।

পাশের ছেলেটি কোথ্‌থেকে একটা পতাকা জুটিয়ে এনেছিল। অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ রঙের প্রকাণ্ড এক নিশান। ওই ধরণের আরো বহুৎ ঐ জনতার মধ্যে ছড়ানো ছিল, তবে এইটেই সবার চেয়ে লম্বা চওড়া। বাঁশের দিকে লম্বা আর পতাকার দিক থেকে চওড়া। এসে বল্ল, "এটাকে পাকড়াও।"

"আমি কি পারবো?" আমার সন্দেহ জাগে।

দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। বাঁশটা বয়সে আমার চেয়ে বড়ো কি না জানিনে কিন্তু বেড়েছে বেআক্কেল রকম। লম্বায় আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় তিনতলা সমান উঁচু হবে। আমার দুর্ব্বল দুই বাহু দিয়ে এই গগনচুম্বী নিশানকে শানাতে পারবো বলে' আমার মনে হয় না। আদাজল খেয়ে লাগলেও জিনিসটা জেয়াদা।

"এই ঝাণ্ডার জন্য জান্ কবুল করেছো আর একে ধরতে পারবে না? বাহ্!" ধমক্ খেতে হোলো ওর।

অগত্যা, ধরলাম—জান্ কবুল করেই। কিন্তু পারবো কেন? বাহুবল কোনোদিনই আমার তেমন নয়,—তথাপি, প্রাণপণে পতাকা আর টাল্ একসাথে সামলাতে লাগলাম।

"পতাকাটা হয়তো আমি রাখতে পারি কিন্তু এই বংশরক্ষা করাই আমার মুস্কিল। তুমি যদি বাঁশটাকে আগ্‌লাও, তাহলে আমি নাহয়—" বলতে না বলতে তিন পাক্ ঘুরে পতাকা-সমেত সেই পাকিস্থানের ওপরে আমি এক আছাড় খেলাম।



ভাগ্যিস্, বাঁশটাকে সে পাক্‌ড়ে ফেলেছিল, নইলে অমন আছাড়ের উপরে উক্ত দণ্ডের মার খেতে হলে, পতাকার মতো আমারও লাঞ্ছনার অবধি থাক্‌ত না।

"আল্লা মেহেরবান্।" বলে' আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

"এখন আমি ধর্‌ছি," ছেলেটি বল্ল, "কিন্তু মিছিলের সময় তোমাকে এটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে—সবার আগে আগে। বিশ জনে মিলে কাজ। মনে থাকে যেন।"

"বিস্‌মিল্লার মর্জি।" বল্‌তে গিয়ে আমার সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। সেই পতাকাবাহী মিছিল সারা কলকাতা ঘুরবে, আর, সমস্ত দিনই আজ এই কাজ, একথাও জানা গেল ছেলেটির শ্রীমুখ থেকে। তার উৎসাহ দেখবার মতো।

এদিকে আমার উদ্দীপনা কিন্তু নিভে এসেছে। আণবিক বোমার বিনা সাহায্যে, একমাত্র পতাকা দ্বারাই আমার হিরোশিমা রচিত হতে দেখি। খানার লোভে এতদূর এসে আমার হিরোইজমের এখন সীমান্তদশা।

আমার গলার কাছটায় কী যেন ঠেলে ঠেলে ওঠে, হয়তো ডাকছাড়া কান্নাই হবে। 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' কিন্তু যে-খানার লালসায় মোগলদের হাতে পড়া গেল তার তল্লাস তো কোনো খানেই পাচ্ছি না। তা এক আধটু পেটে পড়লেও এই সময় বুকে বল পেতাম। কোথাও একটু খানাতল্লাসি করে দেখব নাকি!



কথাটা ছেলেটার কাছে পাড়তেই — "ওঃ, খানা? সেতো ও ই — ঐ খা নে মিলছে।" বলে' একটা ঘেরাটোপ দেয়া জায়গা দেখিয়ে দিল।

যেতেই প্রকাণ্ড এক প্লেট পিরনি পাওয়া গেল। একেবারে হাতে হাতে। হিন্দুস্থানের গোদুগ্ধে পাকিস্থানী চালের সিদ্ধিলাভ—দিব্যি জম্‌জমাট ব্যাপার। চেখে দেখলাম—খেতে বেশ। কিন্তু তাহলেও, পায়েস হলেও খুব আয়েস করে খাবার মতো না। আমার পাকিস্থান-সুলভ জিভ নয় বলেই কিনা কে জানে, জিনিসটা তেমন যেন মিঠে নয়। ঘনীভূত দুধের স্বাদ মধুর হলেও, চিনির সাধ কি তাতে মেটে? এমন খাসা জিনিসটায় একেবারেই মিষ্টি দেয়নি—দিলে এমন চোস্‌তো হোতো যে পাকিস্থানের জয়ধ্বনি দিয়ে আরো দু' পেয়ালা আমি চেয়ে খেতাম।

"আচ্ছা, আমি যদি নিজের পয়সায় সন্দেশ কিনে এই উম্‌দা চীজের সঙ্গে মিশিয়ে খাই, সেটা কি আমাদের ইস্‌লাম-বিরোধী কোনো কাজ হবে?" পায়েস-দাতাকে আমি ভয়ে ভয়ে জিগেস করি।—"যদি তা না হয়তো—" বিপন্ন ইস্‌লামকে নিজের হঠকারিতার দ্বারা আরো বেশি বিপন্ন করার আমার বাসনা ছিল না।

"তুম্‌হারা খুসী।" পরিবেশক আমায় তক্ষুণি ছাড়পত্র ঝাড়ে।

পার্ক পার হয়ে রাস্তার মোড়েই খাবারের দোকান। রসগোল্লা কিনে কুচি কুচি করে' পিরনির সঙ্গে মিকচার করলাম—হিন্দু-মুসলমানের মধুর মিলন রচিত হোলো। তারপরে তার একটুখানি মুখে তুলি—আহা, এমন উপাদেয় আর হয়না। এমন মুখরোচক খানা কখনো খাইনি। রসগোল্লা এবং পায়েস আলাদা আলাদা খেয়েছি, ঢের ঢের, কিন্তু উভয়ের মিলনে-মিশ্রণে এমন একখানা—যাই বলুন্ আপনারা—যেন রসনার মক্কা আর মোক্ষ এক হয়ে—নবজীবন-প্রদ কোনো রসায়ন!

হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানের পাকা-দেখার খাওয়াই যেন,—তুলনাই হয় না। তার তার্ই আলাদা।....তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি—একটু একটু করে'—চেখে চেখে। খাওয়া সারা করার কোনোই আমার তাড়া নেই।...

পার্কের সিংহদ্বার দিয়ে লম্বা এক মিছিল বেরিয়েছে। দেখছি দোকানের আড়ালে বসে'! পায়েসের পিছনে গাঢাকা দিয়ে।

প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। সবার মুখেই মুস্লিম লীগ্ জিন্দাবাদ! সবার আগে আগে সেই ছেলেটি—অভ্রভেদী পতাকা হাতে—উদ্দীপ্ত মুখ।

মিছিল বেরিয়ে গেলে আমি উঠলাম। কিছুদূর গেলাম পিছু পিছু। তারপরে ফিরলাম। এবার আমার কাঁচিস্থানের দিকেই পাড়ি।

সেই দীপ্তমুখ ছেলেটির কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি।...'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' বাস্তবিক!

আর, যাকে সে-শক্তি দাও না তাকে তোমার পতাকাও দাও না।

বোধহয় ভালোই করো।

